Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুসলমানদের কাছে ফিলিস্তিন কেন এত গুরুত্বপূর্ণ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

কারীমা আখতার

রোলঃ 227022441

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুসলমানদের কাছে ফিলিস্তিন কেন এত গুরুত্বপূর্ণ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

কারীমা আখতার
রোলঃ 227022441

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " মুসলমানদের কাছে ফিলিস্তিন কেন এত গুরুত্বপূর্ণ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে কারীমা আখতার, আইডিঃ 227022441 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " মুসলমানদের কাছে ফিলিস্তিন কেন এত গুরুত্বপূর্ণ " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: মুজিবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

কারীমা আখতার

আইডিঃ 227022441

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

ফিলিস্তিনের ভৌগলিক অবস্থান 5
ইতিহাস........ 6
পবিত্র কোরআনে ফিলিস্তিন ভূমির অনন্য মর্যাদা........ 7
পবিত্র ভূমি ফিলিস্তিনে নবী (আ.) গণের বিচরণ 9
আল আকসা পরিচিতি........ 14
আল কিবলি মসজিদ 16
আল –বুরাক প্রাচীর বা ওয়েস্টার্ন ওয়াল........ 18
মুসলিম উম্মাহ'র প্রথম কেবলা বায়তুল মাকদিস........ 19
মেরাজের রাতে বায়তুল আকসায় নবী করিম (সঃ) এর নামায আদায় 22
বায়তুল্লাহ এবং বায়তুল মাকদিসের প্রতিষ্ঠাতা ও সংস্কারক 24
বাইতুল মাকদিসের ইতিহাস........ 26
ফিলিস্তিনে ইসরাইলের আগ্রাসনের পটভূমি........ 32
বেলফোর ঘোষণা........ 32
চিঠির উদ্দেশ্য........ 34
ক্রমবর্ধমান ইহুদি অভিবাসন 34
১৯৪৮ সালের নাকবা অথবা ফিলিস্তিনের জাতিগত নির্মূল 36
নাকসা অথবা ছয় দিনের যুদ্ধ........ 36
প্রথম ইন্তিফাদা ১৯৮৭–১৯৯৩ 36
২০২৩ সাল হতে অদ্যাবধি........ 39
ইসরাইল কর্তৃক পরিচালিত মসজিদুল আকসা'য় কয়েকটি গণহত্যা [৩] 44
ফিলিস্তিনে ইহুদিদের আরও কিছু গণহত্যা 46
যয়তুন বৃক্ষ ও ফিলিস্তিনিদের মধ্যে গভীর মিল 48
দাজ্জাল, ইমাম মাহদি (আ.) ও ঈসা (আ.) এর আগমন এবং কেয়ামতের নিদর্শন সমূহ প্রকাশের ক্ষেত্রে ফিলিস্তিনির গুরুত্ব........ 51
ফিলিস্তিন : মুসলিম উম্মাহ'র জন্য কেন গুরুত্বপূর্ণ........ 57
মুসলিম উম্মাহ'র করণীয়........ 58
ফিলিস্তিনে জিহাদ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে মিশরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাতওয়া এবং আরব ও ইসলামি বিশ্বের প্রতি ফিলিস্তিনের পুনরুদ্ধার এবং মসজিদুল আকসা রক্ষায় উদাত্ত আহবান [৪] 62

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

সমস্ত প্রশংসা সে মহান আল্লাহর যিনি সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। যিনি আসমান, জমিন এবং অন্ধকার ও আলোর সৃষ্টিকর্তা। আর আল্লাহ দুরূদ অবতীর্ণ করেন রহমাতুল - লিল -আলামিন মুহম্মদ (স.) এর ওপর, যিনি আখেরী নবী এবং নবী ও রাসুলগণের সরদার।

ফিলিস্তিন! আজ এক রক্তাত্ত জনপদের নাম। সোস্যাল মিডিয়ায় প্রতিনিয়ত ফিলিস্তিনের নির্যাতিত দের ছবি দেখে অন্তর আত্মা হাহাকার করে উঠে। IOM (Islamic online madrasha) তে অধ্যয়নের সূত্র ধরে "মুসলমানদের কাছে ফিলিস্তিন কেন এত গুরুত্বপূর্ণ" বিষয়ে থিসিস করার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি। থিসিস করতে গিয়ে অনেক অজানাকে জানতে পেরেছি। যার দরুন ফিলিস্তিনকে জানার তৃষ্ণা যেন আরো বেড়ে গেছে। প্রজ্ঞাবান ওস্তাদজদের আন্তরিক সহযোগিতা ছিল অপরিসীম। মহান রাব্বুল আলামিনের দয়ায় এই থিসিসটি করতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি।

আল্লাহ তা'লার নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের যাবতীয় কাজ, কর্ম তাঁর জন্য খাঁটি করে নিয়ে অনুগ্রহ-পূর্বক তার দরবারে গ্রহণ করেন। নিশ্চয়ই, তিনিই আমাদের একক ও অদ্বিতীয় প্রভু এবং সবোত্তম সাহায্যকারী।

ফিলিস্তিনের ভৌগলিক অবস্থান

ফিলিস্তিন মধ্যপ্রাচ্যের দক্ষিণাংশের একটি ভূখণ্ড, যা ভূমধ্যসাগর ও জর্ডান নদীর মাঝে অবস্থিত। এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা এই তিন মহাদেশের জন্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থানে রয়েছে ফিলিস্তিন।

ফিলিস্তিনের ভৌগলিক মানচিত্র

ইতিহাস

ফিলিস্তিনের অপরাপর নামগুলো হলোঃ কানান, জায়ান, ইসরায়েলের ভূমি, দক্ষিণ সিরিয়া, জুন্দ ফিলাস্তিন এবং পবিত্র ভূমি। অঞ্চলটি পৃথিবীর প্রাচীন অঞ্চলগুলোর একটি যেখানে মানুষের বসবাস, কৃষিনির্ভর জনসমষ্টি এবং সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। ব্রোঞ্জ যুগের প্রথম ও মধ্যভাগে স্বাধীন কেনানীয় নগর-রাষ্ট্রগুলো গড়ে উঠেছিল এবং প্রাচীন মিশর, মেসোপটেমিয়া, ফোয়েনেশিয়া, মাইনোয়ান ক্রিট, এবং সিরিয়ায় গড়ে ওঠা সভ্যতা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল। ফিলিস্তিন আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত ফিলিস্তিনের এই সম্পূর্ণ ভূ-খণ্ড বা এর কোন কোন অংশ বিভিন্ন রকমের মানুষদের দ্বারা পরিচালিত ও শাসিত হয়ে আসছে। এদের মধ্যে আছে- কেনানীয়, আমরীয়, প্রাচীন মিশরীয়, ইসরায়েল বংশের ইহুদি, ব্যাবিলনীয়, পারস্য, প্রাচীন গ্রিক, রোমান, বাইজেন্টাইনীয়, প্রাথমিক যুগের মুসলিম খিলাফাত (যেমনঃ উমাইয়াদ, আব্বাসীয়, সেলজুক, ফাতমি প্রভৃতি), খ্রিস্টান ক্রুসেডার বা ধর্মযোদ্ধাগণ, শেষের দিকের মুসলিম খিলাফাত (যেমনঃ আইয়ুবি, মামলুক, উসমানীয় সাম্রাজ্য প্রভৃতি), ব্রিটিশ, জর্ডানি

(পশিম তীরের অংশটুকু), মিশরীয় (গাজা অঞ্চল), এবং হাল আমলের ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনি সহ এরকম বহু জাতি ও অঞ্চলের ব্যক্তি ও শাসকবর্গ।

পবিত্র কোরআনে ফিলিস্তিন ভূমির অনন্য মর্যাদা

১. **পবিত্র কোরআনে ফিলিস্তিন ভূমির শপথ** : পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ প্রাচীন ফিলিস্তিন ভূমির অন্তর্গত 'সিনাই পর্বত' ও ফিলিস্তিনের দুটি ফলের শপথ গ্রহণ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

وَ التِّيۡنِ وَ الزَّيۡتُوۡنِ ۙ﴿۱﴾ وَ طُوۡرِ سِيۡنِيۡنَ ۙ﴿۲﴾

অনুবাদ: 'শপথ ত্বিন ও জয়তুনের; শপথ সিনাই পর্বতের।' (সুরা ত্বিন, আয়াত : ১-৩)

২. **নবী-রাসুলের বিচরণ ভূমি** : আল্লাহ সুবহানহু ওয়া তা'লা ফিলিস্তিন ও তাঁর নিকটবর্তী অঞ্চলে অসংখ্য নবী ও রাসুল প্রেরণ করেছেন এবং লুত (আঃ) সহ একাধিক নবী এই পবিত্র ভূমিতে আশ্রয় লাভ করেছিলেন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ

অনুবাদ: আমি তাঁকে ও লূতকে উদ্ধার করে সেই দেশে পৌঁছিয়ে দিলাম, যেখানে আমি বিশ্বের জন্যে কল্যাণ রেখেছি। (সুরা আম্বিয়া, আয়াত : ৭১)

অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, আয়াতে ফিলিস্তিন ভূমির কথা বলা হয়েছে। অন্যদের মতে, শাম বা সিরিয়ার কথা বলা হয়েছে।

৩. **বরকতময় ভূমি:** পবিত্র কোরআনে মসজিদুল আকসা ও তাঁর আশপাশের অঞ্চলকে বরকতময় ভূমি উল্লেখ করে আল্লাহ সুবহানহু ওয়া তা'লা নিচের আয়াত টি নাযিল করেন:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

অনুবাদ : পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যান্ত-যার চার দিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি যাতে আমি তাঁকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী ও দর্শনশীল। (সুরা বনি ইসরাঈল, আয়াত : ১)

অন্য আয়াতে আল্লাহু সুবহানহু তা'লা বলেছেন:

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ

অনুবাদ: এবং সুলায়মানের অধীন করে দিয়েছিলাম প্রবল বায়ুকে; তা তাঁর আদেশে প্রবাহিত হত ঐ দেশের দিকে, যেখানে আমি কল্যাণ দান করেছি। আমি সব বিষয়েই সম্যক অবগত রয়েছি। (সুরা আম্বিয়াহ, আয়াত : ৮১)

ঐতিহাসিকদের মতে, সোলায়মান (আ.) ফিলিস্তিনের শাসক ছিলেন।

৪. **আবাসস্থল হিসেবে নির্বাচিত ভূমি**: আল্লাহ অসংখ্য নবী-রাসুলের আবাসস্থল হিসেবে এ ভূমিকে নির্বাচিত করেছিলেন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে,

يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ

হে আমার সম্প্রদায়, পবিত্র ভুমিতে প্রবেশ কর, যা আল্লাহ তোমাদের জন্যে নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং পেছন দিকে প্রত্যাবর্তন করো না। অন্যথায় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। (সুরা মায়িদাহ, আয়াত : ২১)

৫. **অসহায় মানুষের আশ্রয় ভূমি** : যুগ যুগ ধরে ফিলিস্তিন অসহায় ও নিরাশ্রয় মানুষের আশ্রয় ভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। বর্তমানে ইসরায়েলের যেসব অধিবাসী আদি ফিলিস্তিনিদের অবৈধভাবে উচ্ছেদ করছে তারাও ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে ফিলিস্তিনে আশ্রয় নিয়েছিল। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا ۖ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ

অনুবাদ: আর যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তাদেরকেও আমি উত্তরাধিকার দান করেছি এ ভুখন্ডের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের যাতে আমি বরকত সন্নিহিত রেখেছি এবং পরিপূর্ণ হয়ে গেছে তোমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুত কল্যাণ বনী-ইসরাঈলদের জন্য তাদের ধৈর্য্যধারণের দরুন। আর ধ্বংস করে দিয়েছে সে সবকিছু যা তৈরী করেছিল ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় এবং ধ্বংস করেছি যা কিছু তারা সুউচ্চ নির্মাণ করেছিল। (সুরা আরাফ, আয়াত : ১৩৭)

পবিত্র ভূমি ফিলিস্তিনে নবী (আ.) গণের বিচরণ

ফিলিস্তিনে অসংখ্য নবী রাসূল গণ বিচরণ করেছেন, কেউ জন্মসূত্রে, কেউ আল্লাহর নির্দেশে এখানে এসেছেন। আখেরি নবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) মে'রাজের রজনীতে ফিলিস্তিন তথা বায়তুল মোকাদ্দাসে ভ্রমণ করেন, এ প্রসঙ্গে কোরআন মজীদে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে:
سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
অনুবাদ : পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যান্ত-যার চার দিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি যাতে আমি তাঁকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী ও দর্শনশীল। (সুরা বনি ইসরাঈল, আয়াত : ১)
মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহিম আ. থেকে শেষ নবী মুহাম্মদ সা. পর্যন্ত প্রায়সব নবী এ ভূমিতেই এসেছিলেন।

ইব্রাহিম (আ.) এর হিজরত:

হযরত ইবরাহিম খলিলুল্লাহ (আ.) ইরাকের বাবেল শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। মূর্তিপূজা না করার কারণে এবং এক আল্লাহর ইবাদতের অপরাধে তার বাবা তাকে দেশান্তরিত করার হুমকি দেয়। কোরআনে এসেছে,
قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ ۖ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ ۖ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا

অনুবাদ: পিতা বললঃ যে ইব্রাহীম, তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ? যদি তুমি বিরত না হও, আমি অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণনাশ করব। তুমি চিরতরে আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাও। (সুরা মারইয়াম, আয়াত নম্বর ৪৬)

অতঃপর ইব্রাহিম (আঃ) তাঁর স্ত্রী সারা, ভাতিজা লুতসহ প্রথমে হাররান, সেখান থেকে হালবে তারপর ফিলিস্তিনের বাইতুল মুকাদ্দাসে হিজরত করেন (আতলাসুল কোরআন ৩০) ফিলিস্তিনেই তিনি মৃত্যু বরণ করেন। জেরুজালেমেই তাকে সমাহিত করা হয়। (কাসাসুল কোরআন ২য়খণ্ড ১৬৪ পৃষ্ঠা)

ইসমাঈল আ.-এর জন্মস্থান:
বাইতুল মুকাদ্দাসে হিজরতের পর দীর্ঘ ২০ বছর নিঃসন্তান থাকেন ইবরাহিম আ.। বিবি সারা ইবরাহিম আ. কে বললেন, আল্লাহ আমাকে সন্তান দেননি। আপনি আমার দাসী হাজেরাকে বিয়ে করেন। হতে পারে আল্লাহ তার থেকে সন্তান দান করবেন। হাজেরার গর্ভে ফিলিস্তিনে

ইসমাঈল আ. জন্মগ্রহণ করেন (কাসাসুল আম্বিয়া ১-২০০)। এরপর আল্লাহর আদেশে শিশু ইসমাঈলসহ হাজেরাকে মক্কায়রেখে আসেন। কোরআনে আল্লাহ বলেন,

رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

হে আমাদের পালনকর্তা, আমি নিজের এক সন্তানকে তোমার পবিত্র গৃহের সন্নিকটে চাষাবাদহীন উপত্যকায় আবাদ করেছি; হে আমাদের পালনকর্তা, যাতে তারা নামায কায়েম রাখে। অতঃপর আপনি কিছু লোকের অন্তরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করুন এবং তাদেরকে ফলাদি দ্বারা রুযী দান করুন, সম্ভবতঃ তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।(সুরা ইবরাহিম, আয়াত নম্বর ৩৭)

ইসহাক আ.-এর জন্মস্থান:

হযরত ইবরাহিম আ.বৃদ্ধ বয়সে তাঁর স্ত্রী সারার গর্ভ থেকে ইসহাক আ.-এর জন্মের সুসংবাদ পেয়েছেন। হযরত ইব্রাহিম আ. সেজন্য মহান আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন যা পবিত্র কোরআনে নিম্নোক্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ

অনুবাদ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আমাকে এই বার্ধক্যে ইসমাঈল ও ইসহাক দান করেছেন নিশ্চয় আমার পালনকর্তা দোয়া শ্রবণ করেন। (সুরা ইবরাহিম, আয়াত নম্বর ৩৯)

ইসহাক আ. ফিলিস্তিনে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ইবরাহিম আ.-এর সঙ্গে সেখানেই বসবাস করেন। তিনি ফিলিস্তিনেই ইন্তেকাল করেন। সেখানেই কবরস্থ হন। (আতলাসুল কোরআন ৩৫ নম্বর পৃষ্ঠা)

-

ফিলিস্তিনে আল্লাহর নবী লুত আ.-এর বসবাস

হযরত লুত আ.-এর বসবাস ছিলো বৃহত্তর ফিলিস্তিনে। তিনি ইবরাহিম আ.-এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন। তার সঙ্গে ফিলিস্তিনে হিজরত করেছিলেন। পরবর্তীতে ইবরাহিম আ.-এর পরামর্শে দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পার্শ্ববর্তী এলাকা সাদুম ও আমুরায় চলে যান।

ইয়াকুব আ.-এর মাতৃভূমি ফিলিস্তিন:

অপর নাম ইয়াকুব আ. ছিলেন হযরত ইসহাক আ. ছেলে। হযরত ইবরাহিম আ. এর নাতি। তাঁর অপর নাম ইসরাঈল। জন্ম ফিলিস্তিনে। ভাই ইসুর সঙ্গে মনোমালিন্য হলে, মা রাফকার পরামর্শে তিনি দক্ষিণ ইরাকের ফাদ্দান আরামে চলে যান। সেখানে দীর্ঘ সময় অবস্থানের পর স্ত্রী-সন্তানসহ ফিলিস্তিনে চলে আসেন (কাসাসুল কোরআন ২ : ১৬৬)। ইয়াকুব আ.-এর বারোজন ছেলে ছিল।

শেষ বয়সে মিশরে হিজরত করেছিলেন তিনি। সেখানেই মৃত্যু বরণ করেন। মিশরেই তাকে সমাহিত করা হয়। মৃত্যুকালে তিনি সন্তানদের ওয়াসিয়ত করেছিলেন, মিশর ত্যাগকালে তার লাশ যেন ফিলিস্তিনে নিয়ে যাওয়া হয়। ওয়াসিয়াত অনুযায়ী তার লাশ ফিলিস্তিনে নিয়ে আসা হয়। ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমি বাইতুল মুকাদ্দাসে সমাহিত করা হয় (আতলাসুল কোরআন ৩৫)।

ইউসুফ আ.-এর শৈশব কাটে ফিলিস্তিনে:

হযরত ইউসুফ আ. হযরত ইয়াকুব আ.-এর ছেলে। দক্ষিণ ইরাকের ফাদ্দান আরামে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। এরপরই পিতা ইয়াকুব আ.-এর সঙ্গে ফিলিস্তিনে চলে আসেন। শৈশবের কিছুদিন ফিলিস্তিনেই কাটে তার। ছোটবেলায় তিনি ভাইদের ষড়যন্ত্রের শিকার হন। পরে নবুয়াত লাভ করার পর মিশরের মন্ত্রী হন।ত ইউসুফ আ. এর ঘটনাকে কোরআন আহসানুল কাসাস বলেছে।

নিজের পিতা ও ভাইদের মিশর নিয়ে আসেন। মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই থাকেন। তবে মৃত্যুকালীন ওয়াসিয়ত অনুযায়ী তার লাশকেও ফিলিস্তিনের বাইতুল মুকাদ্দাসে স্থানান্তরিত করা হয়। (আতলাসুল কোরআন ৪৮ নম্বর পৃষ্ঠা)

আল্লাহর নবী ও ফিলিস্তিনের বাদশাহ দাউদ আ.:

হযরত দাউদ আ. ফিলিস্তিনে জন্মগ্রহন করেন। তিনি আল্লাহ’র নবী ও ফিলিস্তিনের বাদশাহ ছিলেন। পাহাড়-পর্বত, পাখিরা হযরত দাউদ আ. এর অনগত ছিল। এ বিষয়ে আল্লাহ কোরআনে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে:

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ۖ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ

অর্থ: আমি দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম এই আদেশ মর্মে যে, হে পর্বতমালা, তোমরা দাউদের সাথে আমার পবিত্রতা   ঘোষণা কর এবং হে পক্ষী সকল, তোমরাও। আমি তাঁর জন্য লৌহকে নরম করে ছিলাম। (সুরা: সাবা, আয়াত নম্বর ১০)

নবুয়াত লাভের আগে তিনি ফিলিস্তিনিদের পক্ষে তালুতের দলে যুদ্ধে শরিক হন। অত্যাচারী বাদশাহ জালুতকে তিনি হত্যা করেন। আসদুদ, বাইতে দুজান, আবু গাওস, বাইতুল মুকাদ্দাস ও রামলার শাসক ছিলেন তিনি। ফিলিস্তিনেই ইন্তেকাল করেন। বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে রামলাগামী পথের ডানপার্শ্বে একটি পাহাড়ে তাকে সমাহিত করা হয়। (আতলাসুল কোরআন ৬৪ নম্বর পৃষ্ঠা)

হযরত সুলাইমান আ.-এর মাতৃভূমি ফিলিস্তিন:

হযরত দাউদ আ.-এর ছেলে হযরত সুলাইমান আ. । আল্লাহর নবী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি গোটা পৃথিবী শাসনকারী শাসকদের অন্যতম। আল্লাহ তাআলা পশু-পাখি, বায়ুমণ্ডল ও জিন জাতিকে তার অধীন করে দিয়েছিলেন। এই মহান নবীর জন্ম, বসবাস সবই ছিলো ফিলিস্তিন কেন্দ্রিক। তিনি ঐতিহাসিক বাইতুল মুকাদ্দাস মসজিদের নির্মাতা। খ্রিষ্টপূর্ব ৯২৩ সালে ফিলিস্তিনে ইন্তেকাল করেন। বাইতুল মুকাদ্দাসে তাকে দাফন করা হয়। (আতলাসুল কোরআন ৬৮ নম্বর পৃষ্ঠা)

ইয়াহইয়া আ.-এর জন্মস্থান ফিলিস্তিন

আল্লাহর আরেক নবী হযরত ইয়াহইয়া আ.-এর জন্ম ফিলিস্তিনের বাইতুল মুকাদ্দাসে। হযরত জাকারিয়া আ.-এর দোয়ায় আল্লাহ তাআলা বৃদ্ধ বয়সে দান করেন ছেলে ইয়াহইয়া আ.-কে। তার মর্যাদা, তাকওয়া, জনপ্রিয়তা ও আল্লাহর দিকে আহ্বান-এর কারণে তিনি ইহুদিদের চক্ষুশূলে পরিণত হন। যার কারণে বাইতুল মুকাদ্দাসের ভেতরে তাকে শহিদ করা হয়। (কাসাসুল কোরআন ৭ নম্বর খণ্ড ৬২ পৃষ্ঠা)

কিয়ামতের আগে ঈসা আ. ফিলিস্তিনেই নেমে আসবেন:

ঈসা ইবনে মারইয়ামের জন্ম ফিলিস্তিনের বাইতুল লাহামে। যিনি পিতা ব্যতীত আল্লাহর কুদরতের সাক্ষী হিসেবে দুনিয়াতে আগমন করেন। তিনি দোলনায় থাকাবস্থায়নিজের নবুওয়াতের ঘোষণা দেন। মায়ের সতীত্বের সাক্ষ্য দেন। কোরআনে আল্লাহ বলেন,

قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِى غُلَـٰمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ٢٠ قَالَ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ ۖ
وَلِنَجْعَلَهُۥٓ ءَايَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ٢١

মরিইয়াম বললঃ কিরূপে আমার পুত্র হবে, যখন কোন মানব আমাকে স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণীও কখনও ছিলাম না? সে বললঃ এমনিতেই হবে। তোমার পালনকর্তা বলেছেন, এটা আমার জন্যে সহজ সাধ্য এবং আমি তাকে মানুষের জন্যে একটি নিদর্শন ও আমার পক্ষ

থেকে অনুগ্রহ স্বরূপ করতে চাই। এটা তো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার। (সুরা মারইয়াম, আয়াত নম্বর ২০ ও ২১)
তিনি ফিলিস্তিন অঞ্চলে দাওয়াতি কাজ পরিচালনা করেন। মায়ের সঙ্গে মিশরেও গমন করেছিলেন তিনি। সেখান থেকে আবার ফিলিস্তিনে চলে আসেন। অভিশপ্ত ইহুদিরা তাকে জারজ সন্তান ও তার মাকে দুশ্চরিত্রা বলে অপবাদ দেয়। তিনি তাদের বিপক্ষে আল্লাহর কাছে বদ দোয়া করেন। আল্লাহর গজব নেমে আসে ইহুদিদের উপর।

তখন তারা ঈসা আ. কে হত্যার পরিকল্পনা করে। আল্লাহ তাআলা তাকে নিজ কুদরতে জীবিত অবস্থায় আসমানে তুলে নেন। কিয়ামতের আগে তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসে নেমে আসবেন। দাজ্জাল কে হত্যা করবেন। ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন। এরপর তার মৃত্যু হলে নবীজির রওজার পাশে সমাহিত হবেন।

হযরত মুসা (আ.) এর সমাধি:

ফিলিস্তিনের জেরুজালেম থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে হজরত মুসা (আ.)-এর সমাধি অবস্থিত। বুখারি শরিফে নিম্নোক্তভাবে এ সংক্রান্ত হাদীস বর্ণিত আছে:
حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُرْسِلَ
مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلاَم فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لاَ يُرِيدُ
الْمَوْتَ فَرَدَّ اللهُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعْ فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ فَلَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ بِهِ يَدُهُ بِكُلِّ
شَعْرَةٍ سَنَةٌ قَالَ أَيْ رَبِّ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ الْمَوْتُ قَالَ فَالآنَ فَسَأَلَ اللهَ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنْ الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ
رَمْيَةً بِحَجَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ لأَ×رَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ
عِنْدَ الْكَثِيبِ الأَحْمَرِ

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মালাকুল মাওতকে মূসা (আঃ)-এর নিকট পাঠানো হল। তিনি তাঁর নিকট আসলে, মূসা (আঃ) তাঁকে চপেটাঘাত করলেন। (যার ফলে তাঁর চোখ বেরিয়ে গেল।) তখন মালাকুল মাওত তাঁর প্রতিপালকের নিকট ফিরে গিয়ে বললেন, আমাকে এমন এক বান্দার কাছে পাঠিয়েছেন যে মরতে চায় না। তখন আল্লাহ্ তাঁর চোখ ফিরিয়ে দিয়ে হুকুম করলেন, আবার গিয়ে তাঁকে বল, তিনি একটি ষাঁড়ের পিঠে তাঁর হাত রাখবেন, তখন তাঁর হাত যতটুকু আবৃত করবে, তার সম্পূর্ণ অংশের প্রতিটি পশমের বিনিময়ে তাঁকে এক বছর করে আয়ু দান করা হবে। মূসা (আঃ) এ শুনে বললেন, হে আমার রব! অতঃপর কী হবে? আল্লাহ্ বললেনঃ অতঃপর মৃত্যু। মূসা (আঃ) বললেন, তা হলে এখনই হোক। তখন তিনি একটি পাথর নিক্ষেপ করলে যতদূর যায় বাইতুল মাক্বদিসের ততটুকু নিকটবর্তী স্থানে তাঁকে পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছে নিবেদন করলেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি সেখানে

থাকলে অবশ্যই পথের পাশে লাল বালুর টিলার নিকটে তাঁর কবর তোমাদের দেখিয়ে দিতাম। (৩৪০৭, মুসলিম ৪৩/৪২ হাঃ ২৩৭২) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ১২৫১, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ১২৫৮)

(বুখারি: ১৩৩৯; মুসলিম: ২৩৭৫) ভিন্ন এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, হজরত মুসা (আ.) সিনাই পর্বতের কাছে ইন্তেকাল করেন। মুফাসসিরগণের ব্যাখ্যা অনুযায়ী সিনাই পর্বতও প্রাচীন ফিলিস্তিনেরই অন্তর্ভুক্ত। (ইসলামি বিশ্বকোষ ২১/ ২৪৪)

আল আকসা পরিচিতি

আরবি ভাষায়, আল-আকসার দুটি অর্থ রয়েছে : ‘সবচেয়ে দূর’, যা মক্কা থেকে এর দূরত্বকে বোঝায়। পবিত্র কুরআনুল কারীম এ বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে এবং ‘সর্বোচ্চ’ হিসেবেও মুসলিমদের কাছে এর মর্যাদা ও গুরুত্বের কথা তুলে ধরা হয়েছে। আল আকসা মসজিদটি 'মসজিদুল আকসা', 'বাইতুল মুকাদ্দাস' ‘হারাম আল-শরীফ’ নামেও পরিচিত এবং ইহুদিদের কাছে পরিচিত ‘টেম্পল মাউন্ট’ হিসেবে।

ধর্মীয় ভবন, বিভিন্ন ধরনের গম্বুজ, মিনার, স্তম্ভের ঐতিহাসিক কাঠামো ছাড়াও রয়েছে ৩০টি পানির উৎস, যার মধ্যে অজু করার জন্য ব্যবহৃত কূপও রয়েছে।

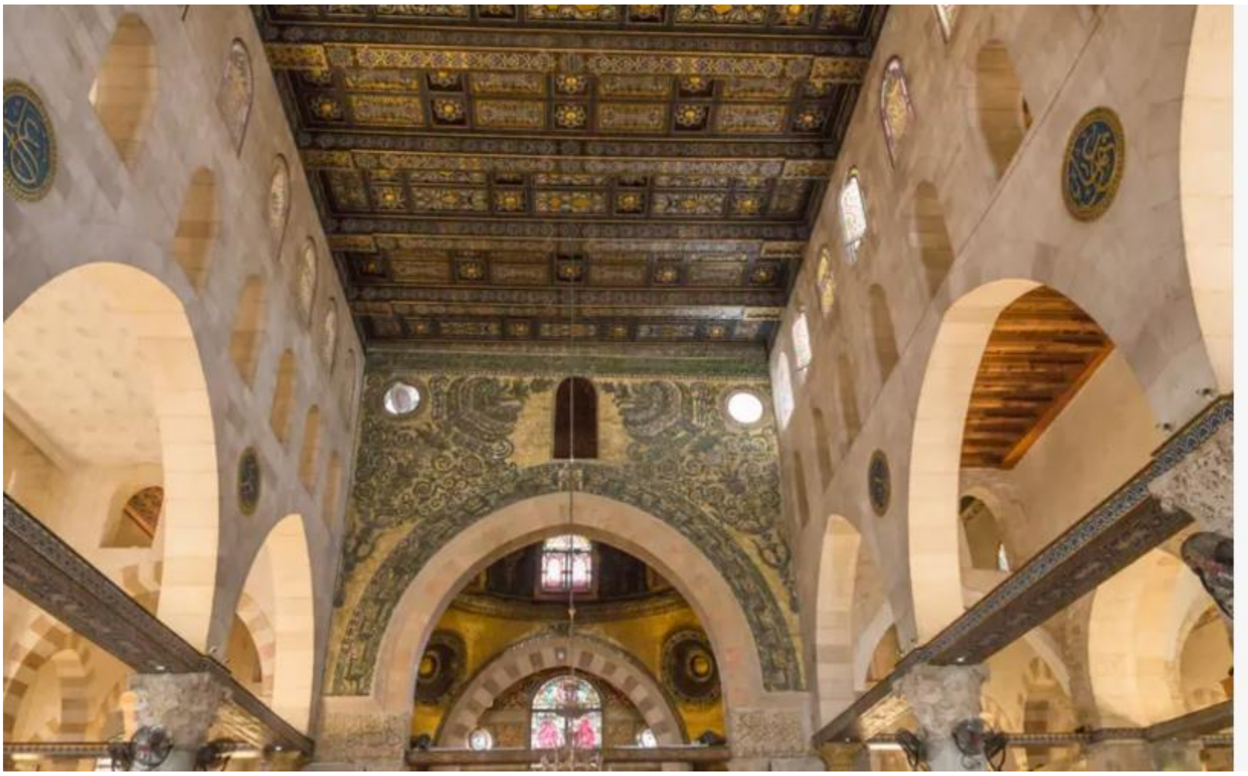

ইসলামি স্থাপত্যকলার নিদর্শন পাওয়া যায় আল আকসায়।

ইসলামি স্থাপত্যের প্রাচীন নমুনার দেখা মেলে আল আকসায়। আল আকসার দেয়ালের অভ্যন্তরে রয়েছে মিম্বার। এবং মামলুক ও আইয়ুবী যুগের ঐতিহাসিক বিদ্যালয়ের নিদর্শনও আছে এখানে।

আল কিবলি মসজিদ

আল আকসা মসজিদ কোনও একক মসজিদ নয়। আল আকসা মসজিদ মানে- কিবলি মসজিদ, মারওয়ান মসজিদ (কুব্বাত-আল-সাখরা) ও বুরাক মসজিদের সমন্বয়। ১৪ হেক্টর এলাকাজুড়ে অবস্থিত রূপালি-গম্বুজ বিশিষ্ট আল কিবলি মসজিদটি আল-আকসার দক্ষিণ প্রাচীরের দিকে রয়েছে এবং এটি এই প্রাঙ্গণে মুসলমানদের নির্মিত প্রথম ভবন। আশি মিটার দৈর্ঘ্য ও ৫৫ মিটার প্রস্থের এই মসজিদটিতে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার মুসল্লি নামাজ আদায় করতে পারেন। এটা এখানকার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্থাপনাগুলোর মধ্যে একটি এবং এখানে মুসল্লিরা নামাজ পড়েন একজন ইমামের নেতৃত্বে।

মুসলমানরা ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে যখন জেরুজালেমে প্রবেশ করে, তখন ইসলামের দ্বিতীয়খলিফা ওমর বিন আল-খাত্তাব এবং তার সঙ্গীরা মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দেন। তখন কিন্তু এলাকাটি অবহেলিত ছিল। এটা প্রথমে একটা সাধারণ ভবন ছিল, কাঠের গুঁড়ির ওপর ভিত্তি করে যেটার কাঠামো নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে মসজিটির যে কাঠামো দেখা যায় তা প্রথম নির্মিত হয়েছিল উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ানের আমলে অষ্টম শতাব্দীর শুরুতে। বেশ কয়েকবার ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মসজিদটি, যা পরে পুনঃনির্মাণ করা হয়। কয়েকবার সংস্কার কাজও করা হয়।
এর শেষ সংস্কার কাজটি হয়েছিল অটোমান আমলে, সে সময়ে সুলতান সুলেমান মসজিদ প্রাঙ্গণের বেশ কয়েকটি সাইট পুনরুদ্ধার করেছিলেন এবং সেখানে কার্পেট ও নানা ধরনের লণ্ঠন স্থাপন করেছিলেন।

বর্তমানে আল-কিবলি মসজিদের নয়টি প্রবেশপথ রয়েছে। পাথর ও মার্বেলযুক্ত স্তম্ভের কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে আছে মসজিদটি। পাথরের স্তম্ভগুলো প্রাচীন, বিশ শতকের গোড়ার দিকে যে সংস্কার কাজ হয়েছিল তখন মার্বেলগুলো যুক্ত করা হয়।

ডোম অফ দ্যা রক : সোনালী গম্বুজের 'ডোম অফ দ্য রক' যা ইসলামী স্থাপত্যের অন্যতম একটি নিদর্শন, এর মধ্যখানে রয়েছে একটি পাথর, যাকে কেন্দ্র করেই এই স্থাপনা নির্মিত। এজন্যই একে বলে 'কুব্বাত আল-সাখরা' বা ডোম অফ দ্য রক (পাথরের গম্বুজ)। উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের নির্দেশে ৬৯২ খ্রিস্টাব্দে তৈরি হয় অষ্টকোণ বিশিষ্ট এই স্থাপনা 'ডোম অফ দ্য রক'। ইহুদিদের বিশ্বাস অনুযায়ী এই পাথর হলো ফাউন্ডেশন স্টোন যা মহাবিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু। আর ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী 'ডোম অফ দ্য

রকের’ ভেতরে রয়েছে সেই পাথর- যেখান থেকে ইসলামের নবী মুহাম্মদ (স.) মিরাজে গিয়েছিলেন।

এই ডোম অব দ্য রকের ভেতরেই রয়েছে সেই পাথরের ভিত্তি - যেখান থেকে নবী মোহাম্মদ (স.) মিরাজে গিয়েছিলেন

আল –বুরাক প্রাচীর বা ওয়েস্টার্ন ওয়াল

আল-আকসার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থান হলো মসজিদের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত ওয়েস্টার্ন ওয়াল, যা আল-বুরাক প্রাচীর নামেও পরিচিত। যেখানে নবী (সঃ) মিরাজে যাবার আগে আল-বুরাক বেঁধে রেখেছিলেন।মরোক্কোন গেট ও প্রফেট গেট বা বাব আল নাবি গেটের মাঝখানে রয়েছে প্রাচীরটি এবং এই এলাকায় একটি ছোট মসজিদও রয়েছে যা বুরাক মসজিদ নামে পরিচিত, যেটা ১৩০৭ থেকে ১৩৩৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নির্মিত হয়েছিল।

অন্যদিকে টেম্পল মাউন্টকে ঘিরে থাকা 'ওয়েস্টার্ন ওয়াল' ইহুদিদের কাছে 'পৃথিবীর ভিত্তিপ্রস্তর' হিসেবে স্বীকৃত ও পবিত্র স্থান। চুনাপাথর দিয়ে বানানো প্রাচীন এই দেয়ালটি 'প্লেস অফ উইপিং' বা 'কান্নার জায়গা' নামেও পরিচিত। ইহুদিরা বিশ্বাস করে যে এটি হেরোডিয়ান উপাসনালয়ের শেষ অবশিষ্ট কাঠামো, যা রাজা হেরোড দ্য গ্রেটের সময় ২০৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সম্প্রসারিত হয়। রোমানরা ৭০ খ্রিস্টাব্দে ধ্বংস করেছিল এটা। প্রতি বছর, কয়েক হাজার ইহুদি ওয়েস্টার্ন ওয়ালে জড়ো হন এবং এই দেয়ালটি ধরে প্রার্থনা করেন ইহুদি ধর্মাবলম্বীরা। দেয়ালের ফাঁক ফোকরে দেখা যাবে অসংখ্য টুকরো টুকরো কাগজ গুঁজে রাখা। সেগুলোর মধ্যে লেখা থাকে এখানে আসা মানুষজনের প্রার্থনা। তারা বিশ্বাস করে এই প্রাচীর হলো সেই জায়গা যেখানে ঈশ্বর সবসময় উপস্থিত থাকেন।

চুনাপাথর দিয়ে বানানো প্রাচীন এই দেয়ালটি আল-বুরাক প্রাচীর, প্লেস অফ উইপিং বা কান্নার জায়গা নামেও পরিচিত।

উৎস,Get

মুসলিম উম্মাহ’র প্রথম কেবলা বায়তুল মাকদিস

কিবলা’ আরবি শব্দ। নামাজ আদায়ের দিকনির্দেশকে কিবলা বলা হয়।
হযরত মুহাম্মদ (সা.) মক্কা ছেড়ে মদিনায় হিজরত করেন ৬২২ খ্রিস্টাব্দের ২৩ সেপ্টেম্বর। রাসুল (সা.) যখন মদিনায় হিজরত করেন তখন ফিলিস্তিনের বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করার বিধান ছিল। বাইতুল মুকাদ্দাস ছিল হজরত ইসহাক (আ.)-এর বংশোদ্ভ,ত হজরত সুলাইমান (আ.)-এর হাতে নির্মিত।
কাবা পৃথিবীর প্রথম ঘর। হজরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর পূর্বপুরুষ হজরত ইবরাহিম ও ইসমাঈল (আ.) এটি পুনঃনির্মাণ করেন। তাই রাসুল (সা.)-এর একান্ত ইচ্ছা ছিল কাবার দিকে ফিরে নামাজ আদায় করা। তাই রাসুল (সা.) মনে মনে কামনা করতেন পুনরায় কাবাকে কেবলা বানানো হোক। বারবার তিনি আসমানের দিকে তাকাতেন, এ ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম আসে কি না! এ বিষয়ে কোরআনে নিম্নোক্ত আয়াত টি নাযিল হয়:
قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

নিশ্চয়ই আমি আপনাকে বার বার আকাশের দিকে তাকাতে দেখি। অতএব, অবশ্যই আমি আপনাকে সে কেবলার দিকেই ঘুরিয়ে দেব যাকে আপনি পছন্দ করেন। এখন আপনি মসজিদুল-হারামের দিকে মুখ করুন এবং তোমরা যেখানেই থাক, সেদিকে মুখ কর। যারা আহলে-কিতাব, তারা অবশ্যই জানে যে, এটাই ঠিক পালনকর্তার পক্ষ থেকে। আল্লাহ বেখবর নন, সে সমস্ত কর্ম সম্পর্কে যা তারা করে। (সুরা বাকারা, আয়াত: ১৪৪)

দ্বিতীয় হিজরি সনের রজব মাসের মাঝামাঝি কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশ আসে। রাসুল (সা.) ও সাহাবায়ে কেরাম খুশি হয়ে কাবা অভিমুখী হয়ে নামাজ আদায় করতে থাকেন।
গবেষকদের মতে, কিবলা পরিবর্তনের দিন হজরত মুহাম্মদ (সা.) এই মসজিদে জোহর কারো কারো মতে আসর নামাজ আদায় করছিলেন। জেরুজালেম নগরীর বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদমুখি হয়ে নামাজ আদায় করছিলেন তিনি। দুই রাকাত নামাজ শেষ করেছেন। ঠিক এমন সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে হজরত জিবরাইল (আ.)-এর মাধ্যমে নির্দেশ আসে কিবলা পরিবর্তনের। রাসূল (সা.)-কে মক্কা নগরীর পবিত্র কাবামুখি হয়ে নামাজ আদায়ের নির্দেশ জানিয়ে দেন হজরত জিবরাইল (আ.)। এই নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথে রাসূল (সা.) ও নামাযরত সাহাবী গণ কেবলা পরিবর্তন করেন।

ইহুদিরা সাধারণত কিবলা হিসেবে জেরুজালেমের দিকে মুখ করে প্রার্থনা করে। মহান আল্লাহতায়ালা পবিত্র কাবার দিকে কিবলা পরিবর্তন করে মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যতা দান করেন। এ ছাড়া নামাজরত অবস্থায় কিবলা পরিবর্তন করে হজরত মুহাম্মদ (সা.) ও সাহাবাগণ আনুগত্যের এক অনন্য নজির স্থাপন করেছেন। তবে ইহুদিরা এতে খুব মনঃক্ষুণ হয়। তারা রাসুল (সা.) ও সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কুৎসা রটাতে থাকে এবং ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। আল্লাহ তাদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেন।
কিবলা পরিবর্তনের এই ঘটনায় বড় বড় অনেকগুলো হিকমত রয়েছে এবং এটি ছিল মুসলিম, মুশরিক, ইহুদী এবং মুনাফিক সকল সম্প্রদায়ের জন্যই পরীক্ষা। মুসলিমদের তো কোন সমস্যাই ছিলনা। আল্লাহর পক্ষ হতে হিদায়াত পাওয়ার কারণে তারা বললেন- আমরা ঈমান এনেছি, সব কিছুই আল্লাহর পক্ষ হতে। তাই আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম। তাদের কাছে বিষয়টি তেমন বড় ছিলনা।মুশরিকরা বলতে লাগল, সে যেমন আমাদের কিবলার (কাবার) দিকে ফেরত এসেছে তেমন অচিরেই আমাদের দ্বীনে ফেরত আসবে। আমাদের কিবলাকে সত্য মনে করেই সেদিকে ফিরে এসেছে। ইহুদীরা বলতে লাগল- সে তাঁর পূর্বের সকল নাবীদের কিবলার বিরোধীতা করছে।মুনাফিকরা বলতে লাগল- জানিনা, এই লোক কোথায় যাচ্ছে? প্রথম কিবলা সঠিক হয়ে থাকলে সে একটি সত্য বিষয় পরিত্যাগ করেছে। আর দ্বিতীয়টি সঠিক হয়ে থাকলে প্রথমে সে বাতিলের উপর ছিল। এ ছাড়া মূর্খরা আরও অনেক কথাই বলেছে। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন-
وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللهُ
“নিশ্চয়ই এটা (কিবলা পরিবর্তন) কঠিন বিষয়, কিন্তু তাদের জন্যে নয়, যাদেরকে আল্লাহ্ পথ প্রদর্শন করেছেন”। (সূরা বাকারা-২:১৪৩)

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ হতে এটি মুমিন বান্দাদের জন্য একটি কঠিন পরীক্ষাও ছিল। যাতে তিনি দেখে নেন কে রসূলের অনুসরণ করে এবং কে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। কিবলার বিষয়টি যেহেতু একটি বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাই আল্লাহ্ তআলা কিবলা পরিবর্তনের পূর্বে ভূমিকা স্বরূপ নাসেখ-মানসুখ তথা শরীয়তের কোন বিষয়কে রহিত করার বিধি-বিধান বর্ণনা করেছেন। এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা‘আলা পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি বলেছেন যে, কোন বিষয়কে মানসুখ (রহিত) করলে তার স্থলে আরও উত্তম হুকুম প্রদান করেন কিংবা অনুরূপ বিষয় স্থাপন করেন। এরপরই তিনি ঐ সমস্ত লোকদেরকে ধমক দিয়েছেন, যারা রসূল (ﷺ) এর হুকুমের বিরুদ্ধে হঠকারিতা প্রদর্শন করে এবং তাঁর হুকুমের সামনে মাথা নত করেনা।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, কিবলা পরিবর্তনের কারণ হল যাতে লোকেরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ উত্থাপন করার সুযোগ না পায়। তারপরও জালেমরা উপরে উল্লেখিত দুর্বল যুক্তি ও অভিযোগগুলো পেশ করে থাকে। নাসিত্মকরা কেবল এগুলো বা এ জাতিয় অন্যান্য দুর্বল যুক্তির মাধ্যমে নাবী-রসূলদের দাওয়াতের বিরোধীতা করে থাকে। যারাই নাবী-রসূলদের কথার উপর অন্যান্য লোকদের কথাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে তাদের যুক্তিগুলোও অনুরূপ।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও সংবাদ দিয়েছেন যে, মুসলিম মিল্লাতের উপর তাঁর নিয়ামাতকে পরিপূর্ণ করার এবং তাদেরকে সঠিক পথের দিশা দেয়ার জন্যই কিবলাকে পরিবর্তন করেছেন এবং কাবাকেই তাদের কিবলা নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা এই পরিপূর্ণ নিয়ামতের বিবরণ দিয়ে বলেন-

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

“যেমন আমি পাঠিয়েছি তোমাদেরই মধ্য থেকে তোমাদের জন্যে একজন রসূল, যিনি তোমাদের নিকট আমার বাণীসমূহ পাঠ করবেন এবং তোমাদের পবিত্র করবেন; আর তোমাদের শিক্ষা দেবেন কিতাব ও প্রজ্ঞা (সুন্নাত) এবং শিক্ষা দেবেন এমন বিষয় যা কখনও তোমরা জানতে না”। (সূরা বাকারা-২:১৫১)

মেরাজের রাতে বায়তুল আকসায় নবী করিম (সঃ) এর নামায আদায়

হিজরতের পূর্বের কথা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একরাতে শুয়ে ছিলেন। তন্দ্রাচ্ছন্ন। চোখদুটো মুদে এসেছে বটে, তবে দিল ছিল জাগ্রত। এরই মাঝে আগমন করলেন হযরত জিবরাঈল আ.। তিনি নবীজীকে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন যমযমের নিকট। একটি স্বর্ণের পেয়ালা আনা হল। তা ছিল ঈমান ও হিকমতে পূর্ণ। তাতে যমযমের পানি। জিবরাঈল আ. নবীজীর বক্ষ মোবারক বিদীর্ণ করলেন। বের করে আনলেন নবীজীর হৃদয়। যমযমের পানি দিয়ে তা ধুয়ে আবার প্রতিস্থাপন করে দিলেন জায়গামত। ঈমান ও হিকমতে পূর্ণ করে দেওয়া হল নবীজীর কলব।

এরপর আনা হল নবীজীকে বহন করার জন্য সওয়ারী। প্রাণীটি গাধার চেয়ে বড় ঘোড়া থেকে ছোট। নাম বুরাক। রং সাদা। এটা এতটাই ক্ষিপ্রগতির যার একেকটি কদম পড়ে দৃষ্টির শেষ সীমায় গিয়ে। এভাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহূর্তেই পৌঁছে গেলেন বাইতুল মুকাদ্দাসে। বুরাক বেঁধে রাখা হল পাথর ছিদ্র করে। যে পাথরে অপরাপর নবীগণ নিজেদের বাহন বেঁধে রাখতেন। নবীজী সেখানে দুই রাকাত নামায আদায় করলেন। নামায পড়ে বের হওয়ার সময় জিবরাঈল আ. নবীজীর সামনে দুটি পেয়ালা পেশ করলেন। একটি দুধের অপরটি শরাবের। নবীজী দুধের পেয়ালা গ্রহণ করলেন। জিবরাঈল আ. বললেন, আপনি (দ্বীনের) স্বভাবসিদ্ধ বিষয়টি নির্বাচন করেছেন।

নবীজী মদের পেয়ালা নেওয়ার পরিবর্তে দুধের পেয়ালা গ্রহণ করায় জিবরীল আ. বলেন, আপনি যদি মদের পেয়ালা নিতেন তাহলে আপনার উম্মত বিভ্রান্ত হয়ে পড়ত।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِيْ رَأَيْتُ مُوْسَى وَإِذَا هُوَ رَجُلٌ ضَرْبٌ رَجِلٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ وَرَأَيْتُ عِيْسَى فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ رَبْعَةٌ أَحْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيْمَاسٍ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِ إِبْرَاهِيْمَ بِهِ ثُمَّ أُتِيْتُ بِإِنَاءَيْنِ فِيْ أَحَدِهِمَا لَبَنٌ وَفِي الآخَرِ خَمْرٌ فَقَالَ اشْرَبْ أَيَّهُمَا شِئْتَ فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ فَقِيْلَ أَخَذْتَ الْفِطْرَةَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে রাতে আমার মি’রাজ হয়েছিল, সে রাতে আমি মূসা (আঃ)-কে দেখতে পেয়েছি। তিনি হলেন, হালকা পাতলা দেহের অধিকারী ব্যক্তি তাঁর চুল কোঁকড়ানো ছিল না। মনে হচ্ছিল তিনি যে ইয়ামান দেশীয় শানূআ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি, আর আমি ’ঈসা (আঃ)-কে দেখতে পেয়েছি। তিনি হলেন মধ্যম দেহবিশিষ্ট, গায়ের রং ছিল লাল। যেন তিনি এক্ষুণি গোসলখানা হতে বের হলেন। আর ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশধরদের মধ্যে তাঁর সঙ্গে আমার চেহারার মিল সবচেয়ে বেশি। অতঃপর আমার সম্মুখে দু’টি পেয়ালা আনা হল। তার একটিতে ছিল দুধ

আর অপরটিতে ছিল শরাব। তখন জিব্রাঈল (আঃ) বললেন, এ দু'টির মধ্যে যেটি চান আপনি পান করতে পারেন। আমি দুধের পেয়ালাটি নিলাম এবং তা পান করলাম। তখন বলা হল, আপনি স্বভাব প্রকৃতিকে বেছে নিয়েছেন। দেখুন, আপনি যদি শরাব নিয়ে নিতেন, তাহলে আপনার উম্মাতগণ পথভ্রষ্ট হয়ে যেত। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৩৯৪)

মিরাজ থেকে ফিরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতীমে বসা। মুশরিকরা ইসরা ও মেরাজের ঘটনা শুনে উপহাস ও কটাক্ষ করতে লাগল। বিভিন্নভাবে নবীজীর দিকে প্রশ্নের তীর ছুড়তে লাগল। তারা চাইল, বাইতুল মুকাদ্দাসের পূর্ণ বিবরণ শুনবে। নবীজী এমন প্রশ্নে খুবই বিব্রত হয়ে ওঠেন। এত রাতে কি বাইতুল মুকাদ্দাসকে ওরকম নিখঁুতভাবে দেখতে গিয়েছেন নাকি! নবীজী বলেন, এরকম বিব্রতকর পরিস্থিতিতে আমি আগে পড়িনি। আল্লাহ তাআলা প্রিয়বন্ধুকে সাহায্য করলেন। নবীজীর চোখের সামনে মেলে ধরলেন বাইতুল মুকাদ্দাসের দৃশ্য। নবীজী দেখে দেখে তাদের প্রত্যেকটি জিজ্ঞাসার বিস্তারিত জবাব দিলেন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ لَمَّا كَذَّبَتْنِيْ قُرَيْشٌ قُمْتُ فِي الْحِجْرِ فَجَلَا اللهُ لِيْ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ

জাবির ইবনু ‘আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন, যখন কুরাইশরা আমাকে অস্বীকার করল, তখন আমি কা‘বার হিজর অংশে দাঁড়ালাম। আল্লাহ্ তা‘আলা তখন আমার সামনে বায়তুল মুকাদ্দাসকে তুলে ধরলেন, যার কারণে আমি দেখে দেখে বাইতুল মুকাদ্দাসের নিদর্শনগুলো তাদের কাছে ব্যক্ত করছিলাম। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৮৮৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৭২)

বায়তুল্লাহ এবং বায়তুল মাকদিসের প্রতিষ্ঠাতা ও সংস্কারক

আল্লাহ তাআলা দুটি ঘর নির্মাণ করেছেন। একটি ছিল মক্কাতুল মকাররামায়। যা বাইতুল্লাহ হিসেবে পরিচিত। যা সর্বপ্রথম নির্মাণ করেছিলেন ফেরেশতারা। তারপর হজরত আদম (আ.) তার সংস্কার করেন। নূহ (আ.)- এর সময়কার বিপর্যযে এর চিহ্ন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তারপর হজরত ইব্রাহিম (আ.) এসে তা নতুন করে নির্মাণ করেন। এই দৃষ্টিকোণে হজরত ইব্রাহিম (আ.) মসজিদের হারামের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না, বরং তিনি একজন মুজাদ্দিস তথা সংস্কারক ছিলেন। তিনি আল্লাহর নির্দেশে বাইতুল্লাহর ধ্বংসাবশেষগুলোকে নবায়ন ও সংস্কারমূলক নির্মাণ করেন। এটা তাঁর কোনো ব্যাক্তিগত পদক্ষেপ ছিল না। বরং তা ছিল একান্ত আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্দেশিত।

অনুরূপ হজরত সুলাইমান (আ.)-ও বায়তুল মাকদিসের মূল প্রতিষ্ঠাতা নন। বিভিন্ন বর্ণনা সূত্র থেকে জানা যায় যে, কাবা যেমন সর্বপ্রথম হজরত আদম (আ.) নির্মাণ করেছিলেন, তদ্রুপ বায়তুল মাকদিসও হজরত আদম (আ.) নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু বিপর্যয়ের সময় এটি ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়। অতঃপর হজরত দাউদ ও হজরত সুলাইমান (আ.) এটিকে সংস্কার করেন, যেমনটি হজরত ইব্রাহিম (আ.) কাবা ঘর সংস্কার করেছিলেন। অতএব এটি একান্ত ইসরায়েলিয়েদের দ্বারা নির্মিত হয়েছে এমনটি বলার সুযোগ নেই।

এছাড়া, হযরত দাউদ এবং হজরত সুলাইমান (আ.) যে এটি নবনির্মাণ করেছেন-তারা আমাদেরও নবি । কাজেই তাদের নির্মাণ ও সংস্কারের ভিত্তিতে ইহুদিদের এটি নিজেদের বলে দাবি করার কোনও অধিকার নেই। আর তাদের ধর্মগ্রন্থ যেটিকে তারা তাওরাত অ্যান্ড ওল্ড টেস্টামেন্ট বলে-সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সুলাইমান জীবনের শেষ সময়ে এসে ধর্মত্যাগ করে মুরতাদ ও কাফেরে পরিণত হয়েছিল। তাদের ভাষ্যমতে তিনি পরকালে অবিশ্বাসী হয়ে মূর্তিপূজা গ্রহণ করেছিলেন। একদিকে তাদের তাওরাত দাবি করছে যে, হজরত সুলায়মান মুরতাদ ও কাফের হয়ে গেছেন। তিনি জীবনের শেষ সময়ে এসে মূর্তিপূজা শুরু করেছেন। অবশ্য কুরআনুল কারি, তাদের এই ভ্রান্ত দাবি প্রত্যাখান করত আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

তারা ঐ শাস্ত্রের অনুসরণ করল, যা সুলায়মানের রাজত্ব কালে শয়তানরা আবৃত্তি করত। সুলায়মান কুফর করেনি; শয়তানরাই কুফর করেছিল। তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা এবং বাবেল শহরে হারুত ও মারুত দুই ফেরেশতার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল, তা শিক্ষা দিত। তারা

উভয়ই একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য; কাজেই তুমি কাফের হয়ো না। অতঃপর তারা তাদের কাছ থেকে এমন জাদু শিখত, যদ্দ্বারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। তারা আল্লাহর আদেশ ছাড়া তদ্দ্বারা কারও অনিষ্ট করতে পারত না। যা তাদের ক্ষতি করে এবং উপকার না করে, তারা তাই শিখে। তারা ভালরূপে জানে যে, যে কেউ জাদু অবলম্বন করে, তার জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। যার বিনিময়ে তারা আত্নবিক্রয় করেছে, তা খুবই মন্দ যদি তারা জানত। (সুরা বাকারা: আয়াত ১০২)

সর্বোপরি একদিতে তারা তাঁকে কাফের, মুরতাদ ও মূর্তিপূজক বলে দাবি করছে। অন্যদিকে বলছে তাদের নবি সুলাইমান নির্মাণ করছে-বিধায় এটা তাদের একটি স্মৃতিস্তম্ভ। তাই আমরাই এটি ও এই ভুমির একমাত্র হকদার।
সারকথা হলো রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে যেমন তারা এর হকদার হয় না। আবার ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও তাদের কোনো অধিকার সাব্যস্থ হয় না। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেন মুসলিম বিশ্বকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য মুসলিম বিশ্বের মূল কেন্দ্রে অস্থিরতা সৃষ্টি করার জন্য ইসরায়েল প্রতিষ্ঠা করে। আর সেই সময় থেকে ক্রমাগত অব্যাহতভাবেই তারা সেখানকার বাসিন্দা ও ফিলিস্তিনিদের ওপর নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে। তাই হামাসের মুজাহিদগণ দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে প্রস্তুতি গ্রহণ করে এই আক্রমন পরিচালনা করে। আর এট সহজেই অনুমেয় ছিল যে তাদের আক্রমনের জবাবে ইসরায়েলও পাল্টা আক্রমন করবে এবং অনেক মুজাহিদ শাহাদাত গ্রহণ করবে। আর বাস্তবে হচ্ছেও তাই।
[১] (ফিলিস্তিন বর্তমান ও অতীত, মুফতি তাকি উসমানি, পৃষ্ঠা নং ৫৪)

বাইতুল মাকদিসের ইতিহাস

বাইতুল মাকদিস সর্বপ্রথম হজরত সুলায়মান আ. নির্মাণ করেছিলেন। তৎকালীন মুসলমানরা হজরত সুলায়মান আ. এর অনুসারী ছিলেন। যতদিন তাদের মধ্যে প্রজ্ঞা ও কল্যাণ, সংগ্রাম ও কর্মের নিদর্শন ছিল, শুধু বাইতুল মাকদিস নয়, হিজাজ ও ইয়েমেনেও বাতাসে দোল খাওয়া বিজয়ী পতাকা তাদের উত্থান ও সাফল্যের জানান দিত এবং ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূল থেকে আফ্রিকার উপকূল পর্যন্ত তাদের একক ক্ষমতা ছিল। কিন্তু হজরত সুলাইমান আ. এর পর যখন তাঁর পুত্র রজবিয়াম সিংহাসনে বসেন, তখন তিনি ক্ষমতায় মত্ত হয়ে তাঁর পিতার সব আদর্র্শ – ঐতিহ্য থেকে দূরে সরে গেল। এর তাৎক্ষণিক ফল এই হলো যে, সুলাইমান আ. এর উরবিয়াম নামক একজন দাস রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে উত্তরে ইসরাইল নামে একটি পৃথক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এখনকার বনি ইসরাইল, যারা তখনকার মুসলমান ছিল, দুই সরকারে বিভক্ত হয়ে গেল। উত্তরে ছিল ইসরাইলি রাজ্য, যার মূল কেন্দ্র ছিল, সামাররা (বর্তমানে নাবলসে), এবং দক্ষিণে ছিল ইয়াহুদি রাজ্য, যার প্রধান কেন্দ্র ছিল জেরুজালেমে (বাইতুল মাকদিসে)।

এই বিরোধ ও অনৈক্যের অনিবার্য ফল এটাই ছিল যে, বনি ইসরাইলের সামরিক শক্তি, যা আগে সাবায়ি সাম্রাজ্যের দরজায় কাঁপন ধরাত, এখন তা পারস্পরিক গৃহযুদ্ধে ব্যয় হতে শুরু করল। ইহুদি এবং ইসরাইল উভয় রাজ্য বছরের পর বছর ধরে এক অপরের সাথে যুদ্ধে লেগে থাকত। ৯৩৭ খ্রিস্টপূর্ব থেকে ৫৮২ খ্রিস্টপূর্ব পর্যন্ত ইতহাসের পুরো সময়টাই এই হৃদয়বিদারক গৃহযুদ্ধে কেটেছিল। এবং এই যুদ্ধে ইসরাইলের প্রায় ৫,৫০০,০০০ শিশুর রক্ত ঝরেছিল, তথাপি ক্ষমতার লোভে এই লড়াই-সংঘাত থামেনি। অন্যদিকে বনি ইসরাইল তাদের পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করে মূর্তিপূজা ও তারকা পূজা শুরু করে। শাসকেরা আমোদ-প্রমোদে ডুবে থাকে, এবং তুচ্ছ বিষয়ে ওলামাদের মাঝে মাজহাবি মতপার্থক্য প্রকট আকার ধারণ করে। এ সময় দীনের আলো ছড়াতে আল্লাহু তাআলার পক্ষ থেকে নবি-রাসুলগণ এক এক আসতে থাকেন। কিন্তু কিছু সময় ব্যতীত বনি ইসরাইলের পুরো সময়টাই ভোগ-বিলাসিতা ও মন্দ কাজে কেটেছিল।

আল্লাহ তাআলা স্বীয় ক্রোধ এবং শস্তি একটি জাতির উপর হঠাৎ নাজির করেন না, বরং প্রথমে বিভিন্নভাবে তাদের সতর্ক করেন। এরই ধারাবাহিকতায় নবি প্রেরণ ছাড়াও ইসরাইলিদের সজাগ করার জন্য সতর্কতামূলক কিছু কিছু শাস্তির সম্মুখীন করান-বিদেশী শক্তিগুলো তাদের উপর আক্রমণ করে এবং তাদের ভূমির কিছু অংশ কেড়ে নেয়, পরবর্তীতে আবার তারা তা ফিরে পায়। আবার কখনো তাদের বাদশাহ তাদের উপর

আক্রমণ করতে উদ্যত হয়, কখনো টায়ারের সম্রাট, কখনো অরামের শাসক তাদের উপর চড়াও হয়, কিন্তু এই সমস্ত আক্রমণ আংশিক ক্ষতির সাথে ফিরে যায়।
বনি ইসরাইলরা দেখছিল, বিদেশি শত্রুরা তাদের দোরগোড়ায় এসে গেছে। তাদের প্রত্যেকেই নিজেদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে যাচ্ছে। কিন্তু তাদের হুঁশ ফিরেনি, চেতনা জাগ্রত হয়নি। কারণ ভোগ-বিলাসিতার নির্জন বাস ছেড়ে আমলের কর্টকময় ঝোপে প্রবেশ করা তাদের মেজাজ বিরুদ্ধ ছিল।
হজরত আরমিয়া, শাইয়া ও হজরত হিজকিল (আ.) আল্লাহর দোহাই দিয়ে তাদেরকে আত্ম সংশোধনের জন্য সতর্কবার্তা দিতে থাকে যে, বাইবেলের রাজা তোমাদের দোরগোড়ায় এসে গেছে। এখনো যদি কোমাদের হুঁশ না ফিরে তাহলে তোমাদের নাম-নিশানা চিরতরে মুছে যাবে। কিন্তু গান-বজনা ও বিলাসিতায় মত্ত লোকেরা ব্যবিলনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল এবং মনে মনে ভেবেছিল, আমরা তো নিরাপদেই আছি।
আর ইহুদি আলেমরা এ ভেবে গর্বিত যে, আমরা আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় বান্দা, আমাদের কিছুই করতে হবে না। শত্রুর সাথে লড়াই করার জন্য আমাদের কোনো চেষ্টা সংগ্রাম করা লাগবে না। শত্রু যখন জেরুজালেমের দিকে আসবে, তখন আসমানের অদৃশ্য শক্তি তাদেরকে প্রতিহত করবে এবং তারা জ্বলে ভস্ম হয়ে যাবে।
ঠিক এমন সময় যখন তারা মদে মগ্ন ও ভোগে মত্ত ছিল এবং আলেমগণ এ বিষয়ে তর্কে মেতেছিল যে, কতজন ফেরেশতা সূঁচের ডগায় বসতে পারে? তখন ব্যবিলনের অত্যাচারী রাজা বখত নাসরান আল্লাহর অভিশাপরূপে আবির্ভূত হয়। জেরুজালেম (বাইতুল মাকদিস) এবং এর আশপাশের এলাকায় ইসরাইলিদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়। তার সেনাবাহিনী ছিল অদম্য, অপ্রতিরোধ্য একটি ঝড়, যা প্রতিরোধের প্রতিটি প্রাচীর ভেঙ্গে দিয়েছিল এবং ইহুদিদের পুরো রাজ্যকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছিল। আর নিপীড়নের এমন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিল যা কল্পনা করতেই গা শিউরে ওঠে। বাদশাহর সামনেই তার ছেলেদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। বাদশাহ এবং অবশিষ্ট ইহুদিদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে ব্যবিলনে নিয়ে যাওয়া হয়। আক্ষেপের অশ্রু ঝরিয়ে, দাসত্বের বেড়ি পরে বখত নাসরানের অধীনেই পঞ্চাশ বছর যাবত তারা মানবেতর জীবন যাপন করে। সূরা বনি ইসরাইলে আল্লাহ প্রদত্ত এই শাস্তির বর্ণনা এভাবে এসেছে,

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ ۚ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا

অতঃপর যখন প্রতিশ্রুতি সেই প্রথম সময়টি এল, তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলাম আমার কঠোর যোদ্ধা বান্দাদেরকে। অতঃপর তারা প্রতিটি জনপদের আনাচে-

কানাচে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। এ ওয়াদা পূর্ণ হওয়ারই ছিল। (সুরা: বনী ইসরাইল, আয়াত: ৫)

এই প্রচন্ড শাস্তি ইসরাইলিদের কিছু চোখ খুলে দিয়েছিল। তাদের দাসত্বের জীবন আগের তুলনায় যথেষ্ট শুচি-শুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে মতবিরোধ-মতানৈক্য কমে গিয়েছিল এবং সবাই জড়ো হয়ে সৃষ্টিকর্তার কাছে ফরিয়াদ জানাতে লাগল। ফলে আল্লাহ তাআলা তাদের আরেকটি সুযোগ দেন। ৫৩৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ইরানের রাজা খসরু ব্যবিলন আক্রমন করে তা জয় করেন এবং ইসরাইলিদের প্রতি করুণা দেখিয়ে পুনর্নির্মাণ ও ফিলিস্তিনে বসতি স্থাপনের অনুমতি দেন।
৫১৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে দ্বিতীয়বারের মতো বাইতুল মাকদিসে বসতি স্থাপিত হলো এবং বনি ইসরাইলিরা উজাইর আ. কাছে কেঁদে কেঁদে তাওবা করল আর ভবিষ্যতে আল্লাহর বিধিনিষেধ মেনে জীবন যানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলো। কিছু সময়ের জন্য তারা তাদের প্রতিশ্রুতিতে অটল ছিল। তারপর ধীরে ধীরে আবারও তাদের বিলাসী জীবন ফিরে এল। পবিত্র কুরআনে তাদের এই নতুন জীবনের কথা এভাবে তুলে ধরা হয়েছে,

- ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا

অতঃপর আমি তোমাদের জন্যে তাদের বিরুদ্ধে পালা ঘুয়িয়ে দিলাম, তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও পুত্রসন্তান দ্বারা সাহায্য করলাম এবং তোমাদেরকে জনসংখ্যার দিক দিয়ে একটা বিরাট বাহিনীতে পরিণত করলাম। (সুরা: বনী ইসরাইল, আয়াত: ৬)

কিন্তু তাদের পূণ্যময় এ জীবন বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। যখন সমৃদ্ধি বাড়ল, ভোগ বিলাসের সমারোহ আবার ফিরে এল। বসতিতে আবারও মূর্তি স্থাপন শুরু করল। এক অপরের সাথে ঝগড়া করার অভ্যাস পুনায় ফিরে এসেছিল। ক্রমান্বয়ে তারা সেই অবস্থায় পৌঁছে গেল, যে অবস্থায় তাদের উপর বখত নাসরের শাস্তি নেমে এসেছিল। এবার বখত নাসরের স্থলে রোমের রাজা অ্যান্টিওকাস এপিফেনেস ১৬৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে জেরুজালেম আক্রমন করে পুনরায় তা ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে।
একে একে বনি ইসরাইলিদের হত্যা করে এবং যারা বেঁচে ছিল তাদের লুটপাট ও নির্বাসিত করে। পবিত্র কোরআনে এই ঘটনাটি এভাবে উল্লেখ করা হয়,
إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

তোমরা যদি ভাল কর, তবে নিজেদেরই ভাল করবে এবং যদি মন্দ কর তবে তাও নিজেদের জন্যেই। এরপর যখন দ্বিতীয় সে সময়টি এল, তখন অন্য বান্দাদেরকে প্রেরণ করলাম, যাতে তোমাদের মুখমন্ডল বিকৃত করে দেয়, আর মসজিদে ঢুকে পড়ে যেমন প্রথমবার ঢুকেছিল এবং যেখানেই জয়ী হয়, সেখানেই পুরোপুরি ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। (সুরা: বনী ইসরাইল, আয়াত: ৭)

এই জাতিকে শেষ সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। রাষ্ট্র তো চারশ বছর আগেই তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। এখন তাদের ভাগ্যে চিরস্থায়ী লাঞ্ছনা ও অপমান লিখে দেওয়া হয়েছে এবং একটি অঞ্চলে একসঙ্গে মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের সুযোগও তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এই ঘটনার পর পেরিয়ে গেছে দুই হাজার একশত বত্রিশ বছর। সেই থেকে আজ অবধি তারা বাইতুল মাকদিস থেকে বিতারিত হয়ে বিক্ষপ্তাকারে এখানে ওখানে বসবাস করছে। কিন্তু অ্যান্টিওকাসের আক্রমণের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে পবিত্র কোরআনে আরও বলা হয়েছে,

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ ۚ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا ۘ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا

হয়ত তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন। কিন্তু যদি পুনরায় তদ্রূপ কর, আমিও পুনরায় তাই করব। আমি জাহান্নামকে কাফেরদের জন্যে কয়েদখানা করেছি।

আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে, তোমরা যদি তোমাদের অবস্থা সংশোধন করো তবে আল্লাহ তোমাদের প্রতি রহম করবেন আর যদি দয়া করার পরে তোমরা আগের ভুলগুলিই পুনরাবৃত্তি করো তবে তোমাদের সাথে একই আচরন করা হবে। তাদের প্রতি আল্লাহর রহমতের বহিঃপ্রকাশ এভাবে হলো যে, বনি ইসরাইলের একটি শাখা ঈসা (আ.) – এর আর্বিভাবের পর তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিল। এদের আমল- আখলাক ইয়াহুদিদের তুলনায় ভালোই ছিল।একদিকে যেমন তাদের মধ্যে ইবাদতের স্পৃহা ছিল, অন্যদিকে সংগ্রাম ও কর্মের চেতনাও ছিল।
ঈসা আ. কে আসমানে উঠিয়ে নেওয়ার পরে তিনশত বছরের দীর্ঘ সংগ্রামের পর বনি ইসরাইলের এই শাখা রোমের বিশাল সাম্রাজ্যের মালিক হয় এবং জেরুজালেমও এদের নিয়ন্ত্রণে আসে। প্রায় চারশত বছর ধরে খ্রিস্টানরা প্রবল প্রতাপের সাথে রোম সাম্রাজ্য শাসন করেছে। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এই জাতি একদিকে যেমন তাদের আদি ধর্মকে বিকৃত করে ফেলে অন্যদিকে ধীরে ধীরে ইহুদিদের বদ অভ্যাসগুলোও তাদের মধ্যে চলে আসে।

অবশেষে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে ফারান চূড়া থেকে নবুওয়াতের শেষ সূর্য উদিত হয়। উভয় জাহানের সর্দার রাসুলে কারিম সা. আবির্ভূত হয়ে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ধর্মকে আসল রূপে পেশ করলেন যেটা তারা অনেক আগেই বিকৃত করে ফেলেছিল। এরপর তাওরাত এবং ইঞ্জিলের প্রকৃত অনুসারীদের মুমলমান ঘোষনা করা হয়।

ইতিহাসের সূচনালগ্নে একদিকে তিনি চরিত্র ও নৈতিকতার শুদ্ধতার অনন্য দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন, অন্যদিকে সংগ্রাম ও কর্মের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ফলাফল এই দাঁড়াল যে, খুব কম সময়েই তারা কিসরা-কায়সারের সব দম্ভ-অহংকার ধলিসাৎ করে দিয়ে পৃথিবী জুড়ে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে নিল।

অহংকার ধূলিসাৎ করে দিয়ে পৃথিবী জুড়ে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে নিল। অথচ তাদের সংখ্যা খুবই কমি ছিল, শত্রুর তুলনায় তাদের অস্ত্র-শস্ত্র খুবই নগন্য ছিল। কিন্তু তারা ইমানি শক্তির সাথে সাথে সংগ্রাম ও কর্মের চেতনায় অনেক এগিয়ে ছিল। তাই অন্যান্য শক্তি তাদের সামনে নতজানু হয়ে পড়ে এবং এররই মধ্যে হজরত ওমর (রা.) সন্ধির মাধ্যমে খ্রিস্টানদের থেকে বাইতুল মাকদিস নিয়ে ফেলে। মুসলমানরা প্রায় পাঁচশত বছর এভাবে শাসন করেছে যে, তারা যেমন ছিল মুমিন তেমনি ছিল মুজাহিদ। অবশেষে বেশ কিছু বিপ্লবের পর বাইতুল মাকদিসের কর্তৃত্ব সেলজুক তুর্কিদের হাতে চলে যায়। এরা ছিল নবমুসলিম। ইসলামের প্রতি আগ্রহ-উদ্দীপনা ও জিহাদি চেতনায় পূর্ণ ছিল তাদের হৃদয়। কিন্তু ইসলামি শিক্ষা তখনো তাদের মধ্যে বদ্ধমূল হয়নি। তাদের আবেগ সংযমের বাইরে চলে গিয়েছিল এবং তারা বাইতুল মাকদিসে আসা খ্রিস্টানদের উপর এমন কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছিল, যা হজরত ওমর রা. কর্তৃক ইয়াহুদিদের সাথে সন্ধিচুক্তি বিরুদ্ধ ছিল। ফলস্বরূপ, রোমান খ্রিস্টানরা এই বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে ক্রুসেডের অভিযান শুরু করে। তখন সত্যিকারার্থে মুসলিমদেরকে দুর্বলতা ঘিরে ধরেছিল। তাই খুব কম সময়ই তারা মুসলিমদের থেকে বাইতুল মাকদিস কেড়ে নিতে সক্ষম হলো। কিন্তু সমষ্টিগতভাবে তাদের মধ্যে সত্যিকারের কিছু মুমিনও ছিল। তাই বাইতুল মাকদিসকে পুনরুদ্ধার করতে সুলতান সালাহউদ্দীন আয়ূবীর আর্বিভাব ঘটল। তিনি ইমানের দাবি সম্বন্ধে পুরোপুরি সচেতন ছিলেন। তারা ক্রিসেন্ট এবং ক্রুশের যুদ্ধে ক্রমাগতভাবে খ্রিস্টানদের পরাজিত করে এবং সামান্য সময়েই বাইতুল মাকদিস পুনরুদ্ধার করে।

এই ঘটনাটি হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীর শুরুতে ঘটেছে। তখন থেকে আজ অবধি বাইতুল মাকদিস মুসললিমদের নিয়ন্ত্রেণে আছে।

এই দীর্ঘ ইতিহাস বর্ণনা করার বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হলো, জেরুজালেম ও এর আশপাশে গত কিছু মাস ধরে যা ঘটেছিল তা এই ভূখন্ডে তিন হাজার বছর ধরে চলে আসা ধারাবাহিক নিয়মানুযায়ীই ঘটেছে। সে সময়ে বনি ইসরাইল আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় জাতি ছিল, তখন

তারা হাতের উপর হাত রেখে বসে থেকে বখত নাসর ও ইস্ত কিসের শাস্তি থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারেনি।

আজও মুসলিম উম্মাহ আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় জাতি। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, সব কুকর্ম এবং বিলাসিতা সত্ত্বেও তারা বিজয়, সফলতা, সম্মান, সমৃদ্ধি এবং পার্থিব উন্নতি-অগ্রগতির চিরন্তন অধিকার সবসময় নিজেদের দখলে রাখতে পারবে। তাদের খারাপ কাজের প্রতিদান স্বরূপ যদি ইসরাইলের মতো অপশক্তিকে তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে অবাক হওয়ার কী আছে! (ফিলিস্তিন বর্তমান ও অতীত, মুফতি তাকি উসমানি)

[২] (ফিলিস্তিন বর্তমান ও অতীত, মুফতি তাকি উসমানি, পৃষ্ঠা নং-১৩১)

ফিলিস্তিনে ইসরাইলের আগ্রাসনের পটভূমি

বেলফোর ঘোষণা

১০০ বছরেরও বেশি সময় আগে ১৯১৭ সালের ২ নভেম্বর বিটেনের তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব আর্থার বেলফোর ব্রিটিশ ইহুদি সম্প্রদায়ের একজন সদস্য লিওনেল ওয়াল্টার রথচাইল্ডকে সম্বোধন করে একটি চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিটি ছিল মাত্র ৬৭ শব্দের। এই চিঠিটিই বেলফোর ঘোষণা নামে পরিচিত।
ওই চিঠিতে লেখা ছিল:

প্রিয় লর্ড রথসচাইল্ড

মহামান্য সরকারের পক্ষ থেকে, নিম্নলিখিত এই বিবৃতিটি আপনাকে পাঠাতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। জায়নবাদী ইহুদি জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সমর্থন দেয়া এই বিবৃতিটি মন্ত্রিসভায় পেশ করা হয়েছে এবং মন্ত্রিসভায় তা অনুমোদিত হয়েছে।
'মহামান্য ব্রিটিশ সরকার ফিলিস্তিনে ইহুদি জনগণের জন্য একটি জাতীয় আবাসভূমি প্রতিষ্ঠাকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখে এবং এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হবে, তবে এটাও নিশ্চিত করা হচ্ছে যে, এমন কিছু করা উচিত হবে না যা ফিলিস্তিনে অবস্থানরত অ-ইহুদি সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও নাগরিক অধিকার কিংবা অন্য দেশে বসবাসকারী ইহুদিরা যে অধিকার এবং রাজনৈতিক মর্যাদা ভোগ করছে, তার কোন হানি হয়।'
আপনি যদি জায়নবাদী ফেডারেশনের কাছে এই ঘোষণা পৌঁছে দেন তাহলে আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবো।

আর্থার জেমস বেলফোর

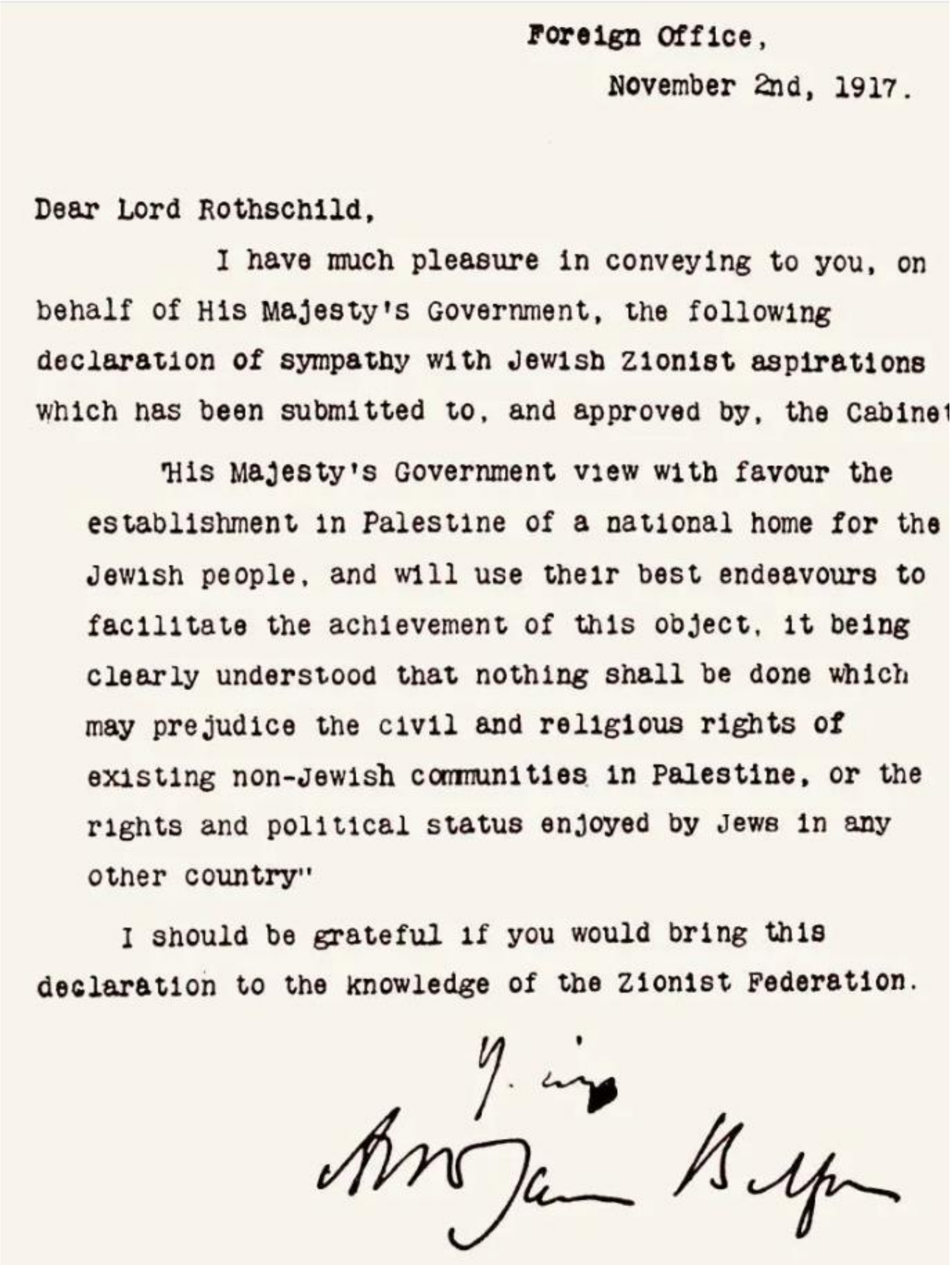
Foreign Office,
November 2nd, 1917.

Dear Lord Rothschild,

I have much pleasure in conveying to you, on behalf of His Majesty's Government, the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations which has been submitted to, and approved by, the Cabinet

"His Majesty's Government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country"

I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation.

Y. sincerely
Arthur James Balfour

এই চিঠিতে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ইহুদিদের জন্য আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার নির্দেশ আসে।

চিঠির উদ্দেশ্য

ব্রিটিশ সরকার আশা করেছিল যে এই ঘোষণার ফলে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী ইহুদিরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯১৪-১৯১৮) মিত্র শক্তির পাশে থাকতে রাজি হবে। ব্রিটিশ নেতারা এবং কতিপয় ইতিহাসবিদ মনে করতেন, ইহুদি সম্প্রদায়ের যথেষ্ট পরিমাণ অর্থনৈতিক শক্তি এবং আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে বড় ধরনের প্রভাব ছিল, যা তাদেরকে যুদ্ধ জয়ী হতে সাহায্য করবে। অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন, প্রথম যুদ্ধের পর ব্রিটেনও মধ্যপ্রাচ্যে তাদের একটি শক্ত অবস্থান ধরে রাখতে চেয়েছিল।

ওই চিঠিটি লেখার পেছনে উদ্দেশ্য যাই থাকুক না কেন, ১৯৪৮ সালে ইসরায়েল রাষ্ট্র গঠন এবং পরবর্তীতে ওই অঞ্চল থেকে লাখ লাখ ফিলিস্তিনির বাস্তুচ্যুত হওয়ার পেছনে এই বেলফোর ঘোষণার বড় ধরনের প্রভাব ছিল।ইসরায়েলিদের জন্য, বেলফোর ঘোষণাটি এমন একটি নথি ছিল যা ইসরায়েলিদের দাবি করা প্রাচীন ভূমিতে ওই জাতির বিকাশ লাভের স্বপ্নকে পূরণ করেছে।
অন্যদিকে ফিলিস্তিনিদের জন্য এই বেলফোর ঘোষণা এমন এক দুঃসময় ডেকে আনে যা আজও অব্যাহত রয়েছে।

ক্রমবর্ধমান ইহুদি অভিবাসন

ফিলিস্তিনিদের রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে একটি ব্রিটিশ আদেশপত্র অথবা ম্যান্ডেট ১৯২৩ সালে তৈরি করা হয়েছিল। স্থায়ী হয়েছিল ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত। এ সময় ইহুদি অভিবাসনকে ব্যাপকভাবে সহায়তা করেছিল ব্রিটিশরা। ইউরোপে নাৎসিবাদের অত্যাচার থেকে পালাতেও অনেকে ফিলিস্তিনে আশ্রয় নিয়েছিল। সেসময় ফিলিস্তিনে আরব স্থানীয় জনসংখ্যা ছিল ৯০ শতাংশেরও বেশি।
ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা আরব বিদ্রোহের সূচনা করেছিল। স্থায়ী হয়েছিল ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত। ১৯৩৬ সালের এপ্রিলে নবগঠিত আরব জাতীয় কমিটি ফিলিস্তিনিদের ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ ও ক্রমবর্ধমান ইহুদি অভিবাসনের প্রতিবাদে ট্যাক্স প্রদান বন্ধ ও ইহুদি পণ্য বয়কটের মাধ্যমে একটি সাধারণ ধর্মঘট শুরু করার আহ্বান জানায়।এ ধরনের ধর্মঘট ছয় মাস স্থায়ী হয়েছিল। তবে নির্মমভাবে দমন করা হয়েছিল ব্রিটিশদের দ্বারা। গণগ্রেফতার অভিযান থেকে শুরু করে বাড়িঘর ধ্বংস করা হয়েছিল।
বিদ্রোহের দ্বিতীয়পর্ব শুরু হয়েছিল ১৯৩৭ সালের শেষের দিকে। ব্রিটিশ বাহিনী ও উপনিবেশবাদকে লক্ষ্য করে এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল ফিলিস্তিনি কৃষক। ১৯৩৯ সালের

দ্বিতীয়র্ধে ব্রিটেন ফিলিস্তিনে ৩০ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করেছিল। সে সময় ফিলিস্তিনের গ্রামগুলোতে বিমান বোমাবর্ষণ, কারফিউ জারি করা, বাড়িঘর ভেঙে দেওয়া অব্যাহত ছিল।
ব্রিটিশরা ইহুদি বসতি স্থাপনকারী সম্প্রদায়ের সঙ্গে সহযোগিতা করে সশস্ত্র দলও গঠন করেছিল সে সময়। ব্রিটিশ নেতৃত্বাধীন ইহুদি যোদ্ধাদের নিয়ে একটি 'বিদ্রোহ দমন বাহিনী' গঠন করেছিল যার নাম ছিল স্পেশাল নাইট স্কোয়াড।
বিদ্রোহের সেই তিন বছরের মধ্যে পাঁচ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছিল। আহতের সংখ্যা ছিল ১৫ থেকে ২০ হাজার। বন্দি করা হয়েছিল পাঁচ হাজার ৬০০ ফিলিস্তিনিকে।
১৯৪৭ সালের মধ্যে ফিলিস্তিনে ইহুদি জনসংখ্যা ৩৩ শতাংসে পৌঁছে। সে সময় তারা ৬ শতাংশ জমির মালিক ছিল। ফিলিস্তিনকে আরব ও ইহুদি রাষ্ট্রে বিভক্ত করতে জাতিসংঘে ১৮১ প্রস্তাব গৃহীত হয়।
ফিলিস্তিনিরা এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল সে সময়। কারণ প্রস্তাবটিতে ফিলিস্তিনের প্রায় ৫৬ শতাংস ইহুদিদের জন্য বরাদ্দ ছিল। যার মধ্যে বেশির ভাগ উর্বর উপকূলীয় অঞ্চলও অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে সময় দেশটির ৯৪ শতাংশের মালিক ছিল ফিলিস্তিনিরা। আর জনসংখ্যা ছিল ৬৭ শতাংশ।

১৯৪৮ সালের নাকবা অথবা ফিলিস্তিনের জাতিগত নির্মূল

১৯৪৮ সালের ১৪ মে ব্রিটিশ ম্যান্ডেট অথবা আদেশপত্র শেষ হওয়ার আগেই ইহুদি রাষ্ট্রের সম্প্রসারণে ফিলিস্তিনি শহর ও গ্রাম ধ্বংস করতে একটি সামরিক অভিযান শুরু করেছিল। ১৯৪৮ সালের এপ্রিলে জেরুজালেমের উপকণ্ঠে দেইর ইয়াসিন গ্রামে ১০০ জনেরও বেশি ফিলিস্তিনি পুরুষ, নারী ও শিশুকে হত্যা করা হয়েছিল।

১৯৪৭ থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত ৫০০টিরও বেশি ফিলিস্তিনি গ্রাম শহর ধ্বংস করা হয়েছিল। যাকে ফিলিস্তিনিরা আরবি ভাষায় 'নাকবা অথবা বিপর্যয়' হিসাবে উল্লেখ করে। গণহত্যায় কমপক্ষে ১৫ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছিলেন।

ইহুদিরা সে সময় ফিলিস্তিনের ৭৮ শতাংশ দখল করেছিল। আর অবশিষ্ট ২২ শতাংশ বর্তমানে অধিকৃত পশ্চিম তীর ও অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকা।

১৯৪৮ সালের ১৫ মে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রথম আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয়। এর পরই শুরু হয় আরব-ইসরাইল যুদ্ধ। ১৯৪৯ সালের জানুয়ারিতে ইসরাইল, মিসর, লেবানন, জর্ডান ও সিরিয়ার মধ্যে যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে তা শেষ হয়।

নাকসা অথবা ছয় দিনের যুদ্ধ

১৯৬৭ সালের ৫ জুন আরব সেনাবাহিনীর একটি জোটের বিরুদ্ধে ছয় দিনের যুদ্ধে ইসরাইল গাজা উপত্যকা, পশ্চিম তীর, পূর্ব জেরুজালেম, সিরিয়ার গোলান হাইটস ও মিসরের সিনাই উপদ্বীপসহ ফিলিস্তিনের বাকি অংশ দখল করে। এটি ফিলিস্তিনিদের জন্য দ্বিতীয় জোরপূর্বক স্থানচ্যুতি বা নাকসা নামে পরিচিত। আর এর আরবি অর্থ 'বিপর্যয়'। সে সময় অধিকৃত পশ্চিম তীর ও গাজা উপত্যকায়ও বসতি স্থাপন শুরু করেছিল ইহুদিরা।

প্রথম ইন্তিফাদা ১৯৮৭-১৯৯৩

১৯৮৭ সালের ডিসেম্বরে গাজা উপত্যকায় প্রথম ফিলিস্তিনি ইন্তিফাদা শুরু হয়। সে সময় ইসরাইলের একটি ট্রাক ফিলিস্তিনি শ্রমিক বহনকারী দুটি ভ্যানের সঙ্গে সংঘর্ষে চার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছিল।

তরুণ ফিলিস্তিনিরা ইসরাইলের সেনাবাহিনীর ট্যাংক ও সৈন্যদের দিকে ঢিল ছুড়লে দ্রুত পশ্চিম তীরে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে।

ইন্তিফাদা প্রাথমিকভাবে তরুণদের দ্বারা পরিচালনা করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে এই বিদ্রোহে অংশ নেয় ইউনিফাইড ন্যাশনাল লিডারশিপ।

১৯৮৮ সালে আরব লীগ প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনকে (পিএলও) ফিলিস্তিনি জনগণের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। ইন্তিফাদা কার্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে জনপ্রিয় সংহতি, গণবিক্ষোভ, আইন অমান্য, সুসংগঠিত ধর্মঘট ও সাম্প্রদায়িক সহযোগিতা। ইসরাইলের মানবাধিকার সংস্থা বি'তেসেলেমের মতে, ইন্তিফাদার সময় ইসরাইলের বাহিনীর হাতে এক হাজার ৭০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। এর মধ্যে শিশু ছিল ২৩৭ জন। গ্রেফতার করা হয়েছিল এক লাখ ৭৫ হাজারেরও বেশি মানুষকে।

অসলো বছর

১৯৯৩ সালে অসলো চুক্তি স্বাক্ষর ও প্যালেস্টাইন অথরিটি (পিএ) গঠনের মাধ্যমে শেষ হয় ইন্তিফাদা। পিএ চুক্তি ইসরাইলকে পশ্চিম তীরের ৬০ শতাংশ ও ভূখন্ডের ভূমি ও পানি সম্পদের বেশির ভাগ নিয়ন্ত্রণ দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় ইন্তিফাদা

দ্বিতীয় ইন্তিফাদা ২০০০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর শুরু হয়েছিল। সে সময় লিকুদ বিরোধী নেতা এরিয়েল শ্যারন জেরুজালেমের পুরাতন শহর ও তার আশপাশে হাজার হাজার নিরাপত্তা বাহিনী নিয়ে আল-আকসা মসজিদ প্রাঙ্গণে সফর করেছিলেন।

ফিলিস্তিনি বিক্ষোভকারী ও ইসরাইলের মধ্যে সংঘর্ষে দুদিনে পাঁচজন ফিলিস্তিনি নিহত ২০০ জন আহত হয়েছিল। ঘটনাটি একটি ব্যাপক বিদ্রোহের জন্ম দিয়েছিল। ইন্তিফাদার সময় ইসরাইল ফিলিস্তিনি অর্থনীতি ও অবকাঠামোর নজিরবিহীন ক্ষতি করেছে। পিএলও নেতা ইয়াসির আরাফাত ২০০৪ সালে মারা যান। তার এক বছর পর দ্বিতীয় ইন্তিফাদা শেষ হয়।

গাজা অবরোধ

ফিলিস্তিনিরা প্রথমবারের মতো সাধারণ নির্বাচনে ভোট দেয় সে সময়। নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় হামাস। ২০০৭ সালের জুনে হামাসের ওপর 'সন্ত্রাসবাদের' অভিযোগ এনে গাজা উপত্যকায় স্থল, বিমান ও নৌ অবরোধ আরোপ করে ইসরাইল।

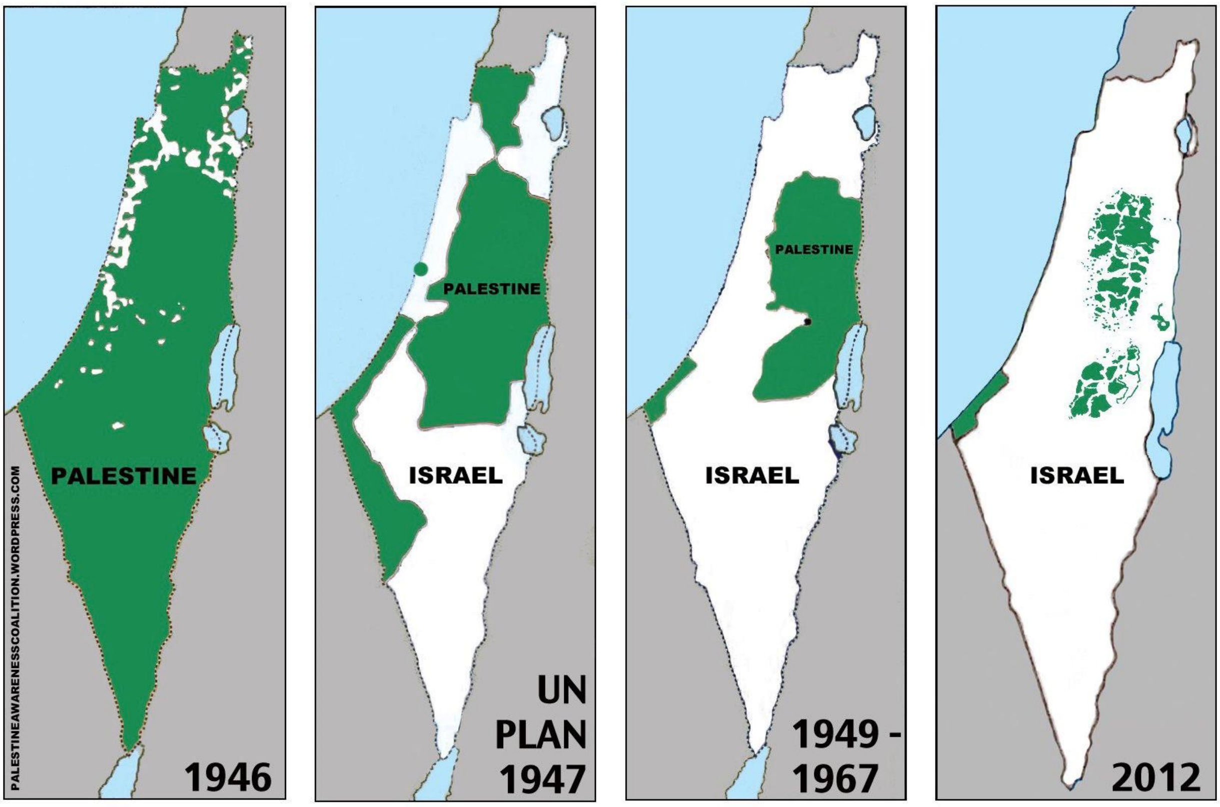

ইসরায়েল আগ্রাসনের কারণে মানচিত্র হতে ফিলিস্তিন বিলুপ্ত প্রায়।
https://aijac.org.au/fresh-air/disappearing-palestine-the-maps-that-lie/

১৯১৭ সাল হতে ২০২০ পর্যন্ত ফিলিস্তিনের মানচিত্র।

গাজায় ২০০৮, ২০১২, ২০১৪ ও ২০২১ সালে চারটি দীর্ঘস্থায়ী সামরিক হামলা করেছে ইসরাইল। হামলায় হাজার হাজার ফিলিস্তিনি নিহত ও কয়েক হাজার বাড়ি, স্কুল ও অফিস ভবন ধ্বংস হয়েছে। (তথ্য সুত্র :আল জাজিরা)

২০২৩ সাল হতে অদ্যাবধি

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাস ও তাদের মিত্রগোষ্ঠী প্যালেস্টাইনিয়ান ইসলামিক জিহাদের ১ হাজার যোদ্ধা ইসরায়েলের ভূখণ্ডে অতর্কিত হামলা চালায়। এতে মোট নিহত হন ১ হাজার ২০০ জন। সেই সঙ্গে ২৪০ জনকে জিম্মি হিসেবে গাজায় ধরে নিয়ে যায়
যোদ্ধারা। ডিসেম্বর, ২০২৩ হতে গাজায় স্থল অভিযান শুরু করে ইসরায়েল।

ইসরায়েলের নির্মম সামরিক অভিযানে ২০২৪ সালে গাজা একটি ধ্বংসস্তূপের শহরে পরিণত হয়েছে। (ছবি: গুগুল)

ইসরায়েলি সেনাবাহিনী গাজার পুরো বসতি এলাকা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। তারা বুলডোজার দিয়ে রাস্তা খুঁড়ে, অবকাঠামো ও বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোকে বোমা মেরে ধ্বংস করেছে। আবাসিক ভবনগুলোকে তারা পিষে ফেলেছে। স্বাস্থ্য এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয়েছে। পানি

সরবরাহ কেন্দ্র, বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং সৌর প্যানেলগুলো ধ্বংস করা হয়েছে। এককথায় ইসরায়েল গাজায় জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু মুছে ফেলার চেষ্টা করেছে। গাজায় এখন ত্রাণ সংকটে খাদ্যাভাব, গাজার বেশিরভাগ মানুষ দিনে একবার খায়।

দেইর আল-বালাহতে ত্রাণের রুটি পেতে বেকারির সামনে জড়ো হওয়া নারীরা। ছবি: এপি।

‘আমার মেয়েরা ক্ষুধার কারণে তাদের আঙুল চুষে, আর আমি তাদের পিঠে হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়াই’, বললেন গাজা উপত্যকার বিধ্বস্ত তাঁবুতে বসবাসরত এক নারী ইয়াসমিন ইদ। দেইর আল-বালাহ’র শরণার্থী শিবিরে ইট দিয়ে বানানো চুলায় ছোট এক পাত্রে ডাল রান্না করছিলেন তিনি। এটিই ছিল বুধবার (২০ নভেম্বর, ২০২৪) তাদের একমাত্র খাবার। এটাই তারা কিনতে পেরেছিলেন।

চার মেয়েকে নিয়ে দিনের একমাত্র খাবার- ডাল সিদ্ধ খাচ্ছেন গাজার এক নারী ইয়াসমিন ইদ। ছবি: এপি।

মাসের পর মাস ধরে ইয়াসমিন ও তার পরিবার ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুমাতে যায়। তিনি বলেন, 'সবকিছুর দাম বেড়ে গেছে, আমরা কিছুই কিনতে পারি না। আমরা সবসময় রাতের খাবার না খেয়েই ঘুমাতে যাই।' **(সূত্র: এপি)**

ফিলিস্তিনে খাদ্যাভাবে অনেক শিশু, বয়োবৃদ্ধ মারা যাচ্ছে। গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি অবরোধ কঠোর করার কারণে চলমান গাজা উপত্যকার দুর্ভিক্ষের **স**ময় খাদ্যাভাবে **০৪ ই** মার্চ ২০২৪ সালে ১০ বছর বয়সী ফিলিস্তিনি শিশু ইয়াজান আল-কাফারনেহের মারা যান।

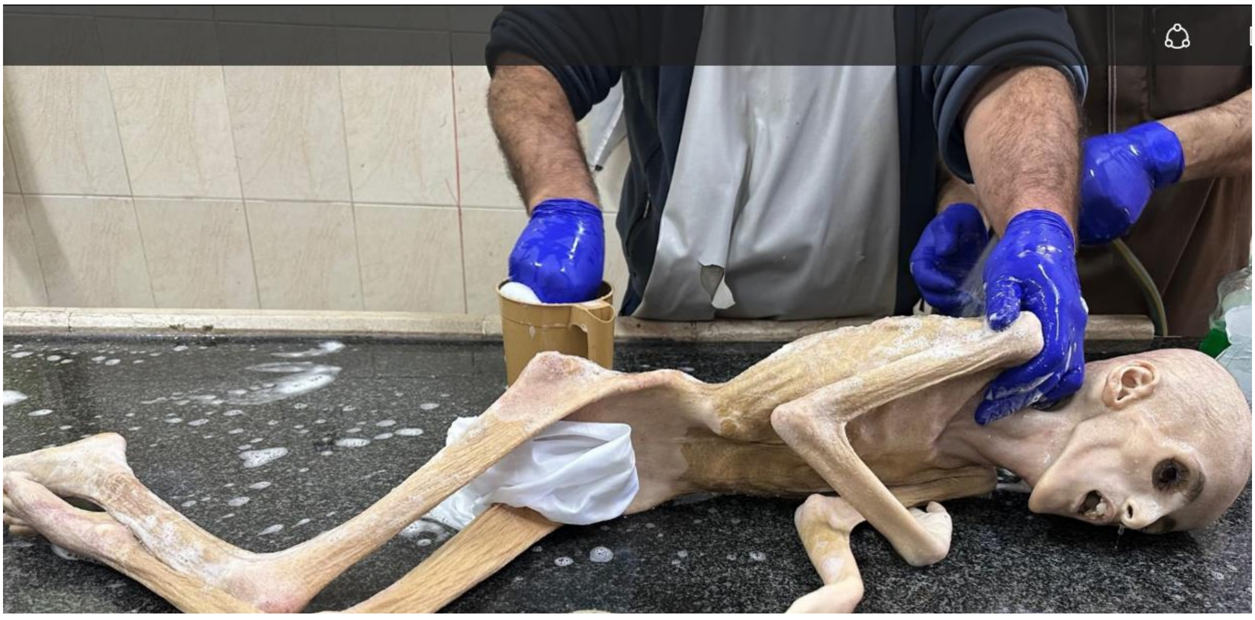

মর্গের পরিচর্যাকারীরা ১০ বছর বয়সী ফিলিস্তিনি শিশু ইয়াজান আল-কাফারনেহের মৃতদেহ ধুয়ে ফেলছে। (ছবি: গেটি ইমেজের মাধ্যমে রাবি আবু নোকাইরা/আনাদোলু)

দখলদার ইসরাইলি বাহিনীর অব্যাহত নির্মম সামরিক অভিযানে ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় মোট নিহতের সংখ্যা ৪৪ হাজার ছাড়িয়েছে। ২১ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলেছে, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া ইসরাইলি আগ্রাসনে এখন পর্যন্ত ৪৪ হাজার ৫৬ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এ সময় দখলদার বাহিনীর হামলায় আহত হয়েছেন এক লাখ ৪ হাজার ২৬৮ জন। হতাহতদের মধ্যে অধিকাংশই নারী ও শিশু। মন্ত্রণালয় আরও বলছে,তবে নিহতের প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশি।কারণ যেসব মৃতদেহ ধ্বংসস্তূপের তলায় চাপা পড়ে আছে, সেগুলো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি এবং গণনার মধ্যেও ধরা হয়নি। (তথ্যসূত্র :আল-জাজিরা)

ফিলিস্তিনে ক্রমশ: বাড়ছে লাশের সারি।

শিশুদের যন্ত্রণা, কাতরতা ও কষ্টের দেখে প্রতিটি মুসলমান হৃদয় ব্যাকুল। যে বিশ্বশক্তিগুলো নিজেদেরকে মানাবাধিকারের ধারক-বাহক বলে দাবি করে, তারা নীরব দর্শকের ভূমিকায় বসে এই বর্বরতা দেখেই ক্ষান্ত হচ্ছে না- উপরন্তু তাদের এই বর্বরোচিত নৃশংস কাজে আরও উৎসাহ যোগাচ্ছে এবং প্রকাশ্যে ঘোষনা করছে যে, আমরা ইসরাইলের পাশে আছি।

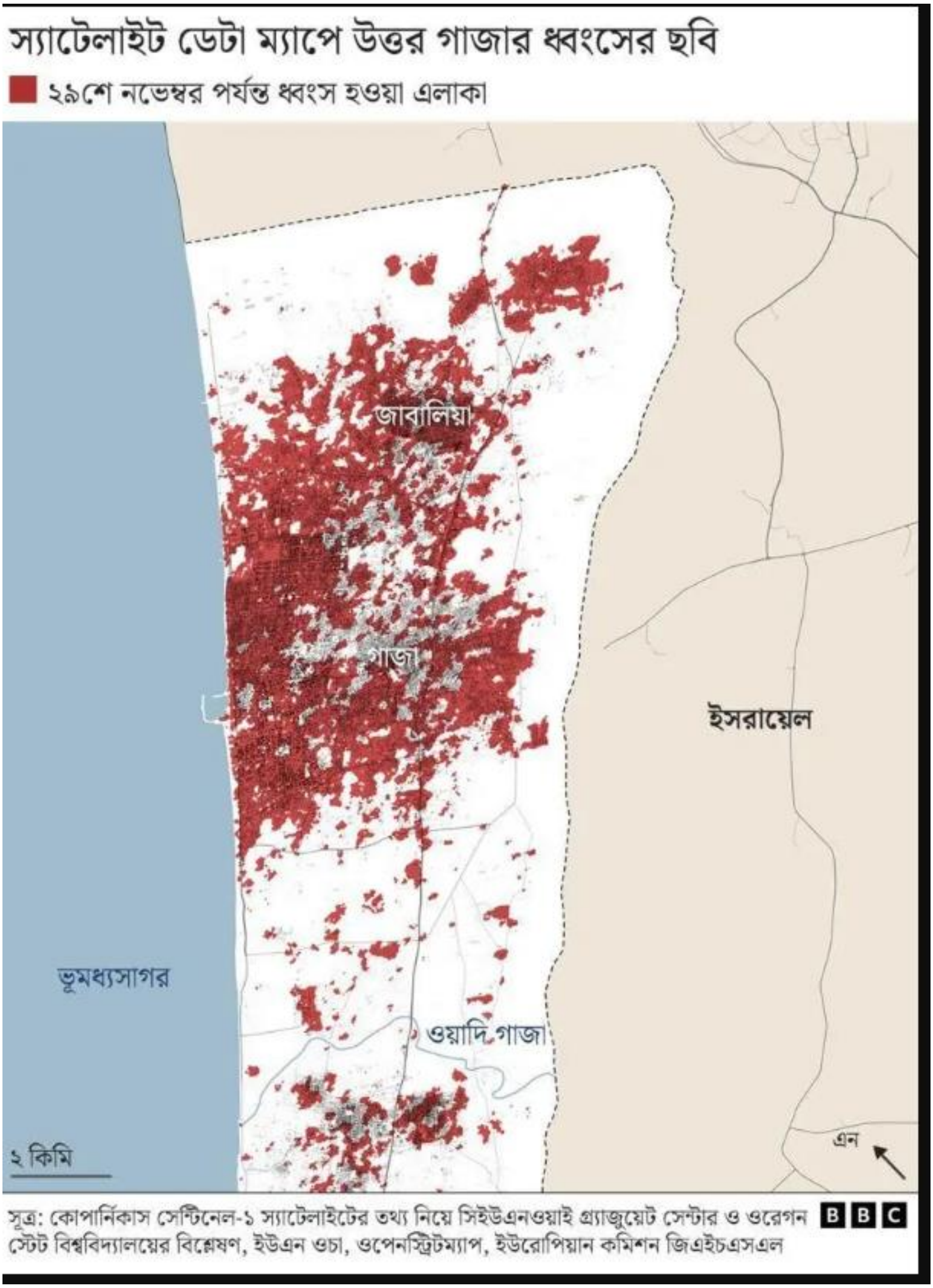

ডিসেম্বর, ২০২৩ হতে ২৯শে নভেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত ইসরায়েলি নির্মম সামরিক অভিযানে উত্তর গাজার ধ্বংসের ছবি।

অক্টোবর, ২০২৪ এ ইসরায়েল লেবাননে তাদের সহিংস আক্রমণ বাড়ায়। জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এ পর্যন্ত বেশ কয়েকবার গাজায় সামরিক অভিযান বন্ধের জন্য ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে আহ্বান জানিয়েছে। ইতোমধ্যে

জাতিসংঘের আদালত নামে পরিচিত ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিসে (আইসিজে) ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যার মামলাও দায়ের করা হয়েছে। তবে নেতানিয়াহু স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন,হামাসকে পুরোপুরি দুর্বল ও অকার্যকর করা এবং জিম্মিদের মুক্ত করার আগ পর্যন্ত অভিযান চলবে গাজায়।

ইসরাইল কর্তৃক পরিচালিত মসজিদুল আকসা'য় কয়েকটি গণহত্যা [৩]

মসজিদুল আকসার প্রথম গণহত্যা: ১৯৭০ সালের ৮ই অক্টোবর। সোমবার। এ দিন জোহর নামাযের পূর্বে ইহুদিদের গঠিত "হাইকাল রক্ষীবাহিনী" মসজিদুর আকসা প্রাঙ্গনে তাদের কল্পিত তৃতীয় হাইকাল অর্থাৎ উপাসনালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে। শহরের অধিবাসীগণ এই নাপাকি থেকে মসজিদুল আকসাকে মুক্ত করার জন্য রুখে দাড়াঁন। এর ফলে অনিবার্য উভয়পক্ষে সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। গ্যারসন স্যালমনের নেতৃত্বাধীন হাইকাল রক্ষীবাহিনী সেদিন মসজিদুল আকসায় নামায আদায়ে ইচ্ছুক ৫০০ নিরস্ত্র মুসল্লির ওপর হামলা করে। তারা মসজিদুল আকসা প্রাঙ্গনে নামাযরত ব্যাক্তি, শিশু, বৃদ্ধ এবং মহিলাদের ওপর নির্বিচারে অগ্নিগোলক নিক্ষেপ করে। এতে ২১ জন মুসল্লি ঘটনাস্থলে শহিদ হন। ১৫০ জনের মতো মুসল্লি সেখান থেকে বেরুতে সক্ষম হলেও ২৭০ জন মসজিদুল আকসা প্রাঙ্গণের ভেতর ও বাইরে আটকে থাকেন।

মসজিদুল আকসার দ্বিতীয় গণহত্যা: ১৯৯৬ সালের ২৩ শে সেপ্টেম্বর। ঘটনাক্রমে এ দিনটিও ছিল সোমবার। এদিন দখলদার ইহুদি বাহিনী মসজিদুল আকসার দক্ষিণ দেয়াল সংলগ্ন সুড়ঙ্গ খুলে দেওয়ার ঘোষনা দেয়। এর ফলে ফিলিস্তিন পুলিশ ও জনগন দখলদার ইহুদি বাহিনীর মধ্যে তুমুল লড়াই হয়। মসজিদুল আকসার প্রতিরক্ষায় ফিলিস্তিনি জনগণ প্রাণপণ লড়াই করে। তিনদিনব্যাপী এই সংঘর্ষে শহীদ হন ৫১ জন ফিলিস্তিনি মুসলিম এবং ৩০০ জন হন আহত। অপরদিকে ১৫ ইহুদি নিহত হয় এবং ৭৮ জন হয় আহত।

মসজিদুল আকসার তৃতীয় গণহত্যা: ২৮/০৯/২০০০ খ্রিষ্টাব্দ। বৃহস্পতিবার। এ দিন ইহুদি পিশাচ এরিয়েল শ্যারন মসজিদুল আকসা পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত নেয়। ঈমানি চেতনায় বলিষ্ঠ ফিলিস্তিন যুবসমাজ দাঁড়িয়ে যায় এর বিরুদ্ধে। পবিত্র মসজিদুল আকসাকে একজন পাপিষ্ঠ ইহুদির পদছাাাপে কলুষিত করতে দিতে তারা ইচ্ছুক নয়। এর ফলে সঙ্গে ৯০০০ সেনা থাকা সত্ত্বেও এরিয়েল শ্যারন মসজিদুল আকসা পরিদর্শনে ব্যর্থ হয়। পরদিন মুসল্লিগণ যখন জুমার নামাযরত, সালাম ফিরানোর পূর্বেই তাদের উপর ইহুদি বাহিনী অগ্নিগোলক নিক্ষেপ করতে শুরু করে। এরপর মসজিদুল আকসা প্রাঙ্গনের নিরস্ত্র মুসল্লিগণ ঈমানি চেতনায় বলিষ্ঠ হয়ে রুখে দাঁড়ান অত্যাধুনিক অস্ত্রেসস্ত্রে সজ্জিত দখলদার ইহুদিদের বিরুদ্ধে। যা রূপ নেয় মানবেহিহাসের অন্যতম হৃদয়বিদারক এক ট্র্যাজেডিতে। এদিন জুমার নামাজ পড়তে

নিরস্ত্র মুসল্লিগণের মধ্য হতে ২৫০ জন শহিদ হয়ে মহান প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যান। আরও অনেকেই হন আহত। এরপর ফিলিস্তিনের প্রতিটি প্রান্তে, পশ্চিমাঞ্চল, গাজা এবং অন্যান্য ৪৮ টি অঞ্চলে বিক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। যা রূপ নেয় ফিলিস্তিনের দ্বিতীয় ইন্তিফাদায়। ২০০০ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়ে তা সমাপ্ত হয় ২০০৫ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি। [http://www.palestinehistory.com/issues/massacre/mass06.htm]

<u>হেবরনের মসজিদে ইবরাহিমি হত্যাকান্ড</u>: ১৯৯৪ সালের ২৬ শে ফেব্রুয়ারি মোতাবেক ১৫ রমজান ১৪১৪ হিজরি। তখন দখলদার ইহুদিদের প্রধানমন্ত্রী ছিল আইজ্যাক রবিন। সাহরি শেষে প্রশান্তমনে মুসল্লিগণ গিয়েছিলেন ফজরের নামাজে। হেবরনের মসজিদে ইবরাহিমি সেদিন সাক্ষী হয় এক নির্মম গণহত্যার।

ছবি: রক্তাক্ত সেই মসজিদে ইবরাহিমি

উগ্রপন্থী ইহুদি পিশাচ বারুচ গোল্ডস্টেইন- যে ছিল পেশায় একজন চিকিৎসক, সে ছিল এই গণহত্যার প্রধান ক্রীড়ানক। সঙ্গে করে ২৯ জন উগ্রপন্থী ইহুদিকে নিয়ে সে নির্বিচারে গণহত্যা চালায় নামাযরত মুসল্লিদের ওপর। নরাধম গোল্ডস্টেইন মসজিদের একটি খুঁটির আড়ালে দাঁড়িয়ে মুসল্লিদের সেজদায় যাওয়ার অপেক্ষা করতে থাকে। মুসল্লিরা সেজদায় যেতেই সে তার আগ্নেয়াস্ত্র থেকে মুসল্লিদের মাথা লক্ষ্য কের গুলি করতে থাকে। অপরদিকে তার সহযোগীরা বোমা এবং অগ্নিগোলক সরবরাহ করতে থাকে। এভাবেই ৩৫০ এর অধিক মুসল্লিকে তারা আঘাত করে। এই গণহত্যা চলার সময়ে দখলদার ইহুদি বাহিনী বাইরে থেকে মসজিদের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়। যেন মুসল্লিগণ পালাতে না পারেন।

অন্যদেরকেও এ সময় তার মসজিদে প্রবেশে বাধা প্রদান করে। মসজিদের ভেতর যখন গণহত্যা চলছে তখন বাইরে ইহুদিরাও থেমে নেই। তারাও নিজেদের আগ্নেয়াস্ত্রের মাধ্যমে বাইরে থাকা মুসলিমদের ওপর হামলা শুরু করে। এই নৃশংস গণহত্যায় পঞ্চাশের অধিক মুসল্লি নিহত হন। যাদের মধ্য হতে ২৯ জন মতান্তরে ৩৩ জন মসজিদের ভেতরেই নিহত হয়েছিলেন। যাদের নামের তালিকা সংরক্ষিত আছে। তবে নিহতের সংখ্যা আরও বেশি হতে পারে। এছাড়া প্রায় ২০০ মুসল্লি গুরুতর আহত হন। [আল –মাজাবিহুল ইসরাইলিয়্যাতু ফি ফিলিস্তিন, আল জাজিরা।]

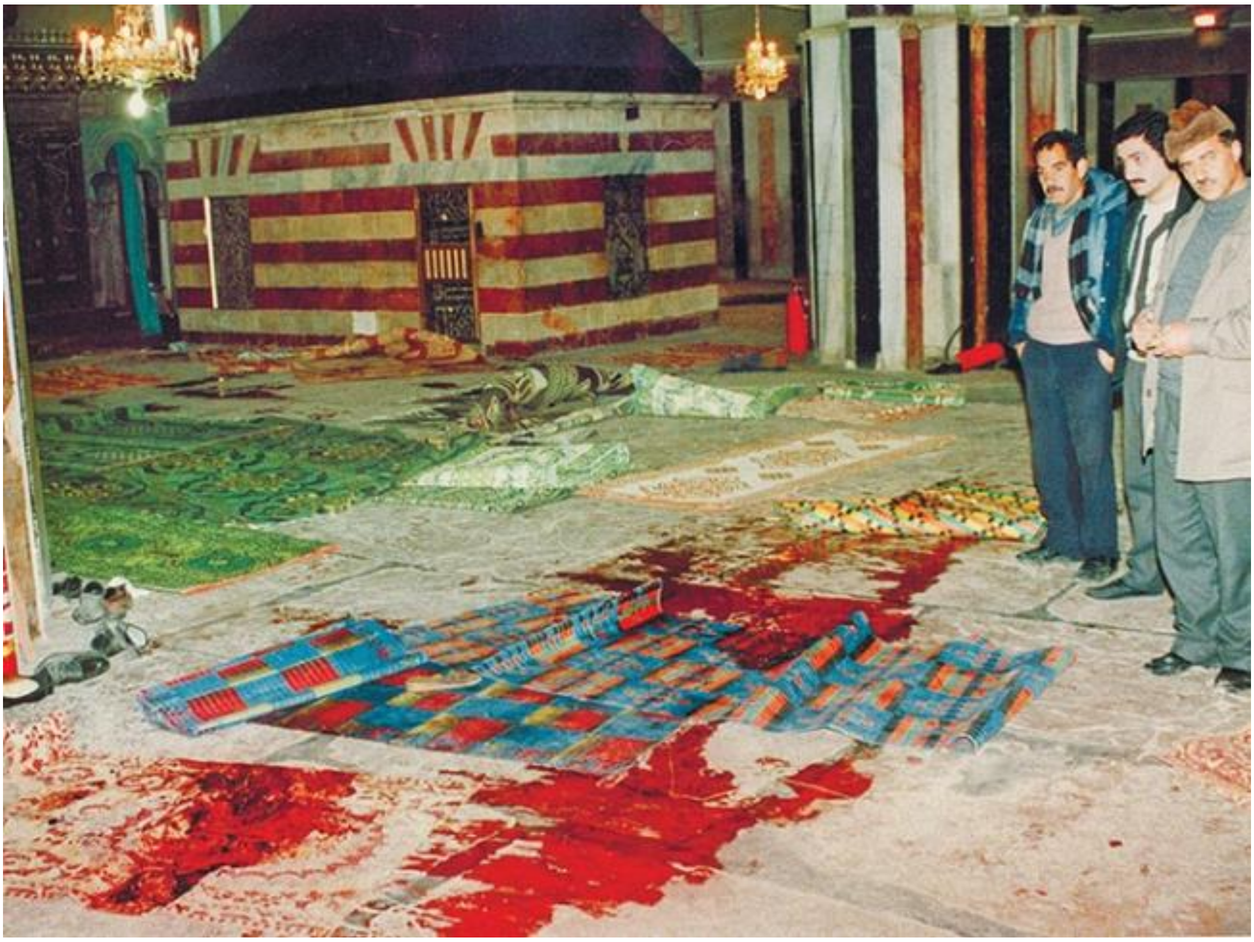

ছবি: হেবরনের রক্তাক্ত সেই মসজিদে ইবরাহিমি

ফিলিস্তিনে ইহুদিদের আরও কিছু গণহত্যা

বালদাতুশ শাইখ (বর্তমান নাম তিল গিনান) গণহত্যা	৩১/১২/১৯৪৭	৬০০ জন নিহত
আবু শুশা (রামলা) গণহত্যা	১৪/০৫/১৯৪৮	৫০ জন নিহত
তানতুরা (হাইফা) গণহত্যা	২২/০৮/১৯৪৮	৯০ জন নিহত

কিবিয়া গণহত্যা (এরিয়েল শ্যারনের নেতৃত্বে)	১৪/১০/১৯৫৩	৬৭ জন নিহত
কালকিলিয়া গণহত্যা	১০/১০/১৯৫৬	৭০ জনের অধিক নিহত
কাফর কাসিম গণহত্যা	২৯/১০/১৯৫৬	৪৯ জন নিহত
খান ইউনুস শরণার্থী শিবির গণহত্যা	৩/১১/১৯৫৬	৩৭৫-৪০০ জন নিহত
জেনিন শরণার্থী শিবির হত্যাকান্ড	২৯/০৩ এবং ৯/৪/২০০২	২০০ এর অধিক নিহত

এই ছিল ফিলিস্তিন মুসলিম জনগণের ওপর ইহুদির কিছু মর্মান্তিক গণহত্যার বিবরণ [আল –মাজাবিহুল ইসরাইলিয়্যাতু ফি ফিলিস্তিন, আল জাজিরা।]। ইতিহাসের পাতায় খুঁজলেই এ সকল হৃদয়বিদারক ট্র্যাজেডির কারণ বিবরণ পাওয়া যাবে।

[৩] ফিলিস্তিন: বেচেঁ থাকার লড়াই, ড.রাগিব সারজানি, পৃষ্ঠা ১৭১)

যয়তুন বৃক্ষ ও ফিলিস্তিনিদের মধ্যে গভীর মিল

কৃষিভিত্তিক সমাজ হিসেবে ফিলিস্তিনিদের সংস্কৃতিতে এবং সামষ্টিক চেতনায় ভূমির একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। জলপাইগাছ তথা যয়তুন বৃক্ষ এই সংযোগের প্রতীক। পবিত্র কোরআনে সুরা ত্বীন নামে একটি সুরা আছে এবং আল্লাহ সুবহানহুতা'লা যয়তুনের শপথ করে নিচের আয়াতটি নাযিল করেছেন:
وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ

শপথ আঞ্জীর (ডুমুর) ও যয়তুনের (সুরা ত্বীন, আয়াত ০১)

জলপাইগাছের প্রাচীন ইতিহাস আছে। শত প্রতিকূলতায় এই গাছ টিকে থাকতে পারে। এর শিকড় অনেক নিচে গেড়ে যায়। এই গাছের সঙ্গে ফিলিস্তিনিদের গভীর মিল আছে। ফিলিস্তিনি পরিবারগুলো এই গাছগুলোকে যত্ন করে, যেমন তারা তাদের ঐতিহ্যকে যত্ন করে। জলপাই সংগ্রহ করা, তা থেকে তেল বের করা এবং প্রিয়জনদের সঙ্গে সেই তেল ভাগ করা তাদের সংস্কৃতি সংরক্ষণের মতোই একটি কাজ। এ কারণেই ইসরায়েলি সেনাবাহিনী এবং ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীরা ফিলিস্তিনিদের জলপাইবাগানগুলো ধ্বংস করে আনন্দ পায়।

জলপাইগাছের প্রাচীন ইতিহাস আছে। শত প্রতিকূলতায় এই গাছ টিকে থাকতে পারে। এর শিকড় অনেক নিচে গেড়ে যায়। এই গাছের সঙ্গে ফিলিস্তিনিদের গভীর মিল আছে। । *ছবি: রয়টার্স*

ইসরায়েলি সেনাদের হাত থেকে রক্ষার জন্য জলপাই গাছ আঁকড়ে ধরে আছেন ছবিতে থাকা নারী। (ছবি: মোমেন্ট ম্যাগাজিন)

ফিলিস্তিনিদের ঐতিহ্য, অস্তিত্ব ও সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অংশ জলপাই গাছ। জাতিসংঘের এক হিসাব অনুযায়ী, পশ্চিম তীর ও গাজায় কৃষিজমির প্রায় ৪৮ শতাংশে জলপাই গাছ রয়েছে, কিন্তু সেই গাছের ওপরই বর্বরোচিত হামলা চালায় ইসরায়েলি সেনা ও সেটেলাররা। তারা জানে, একটি জলপাইগাছ ধ্বংস করলে তা শুধু ফিলিস্তিনিদের জীবিকার ওপর আঘাত হানে না, এটি ফিলিস্তিনি পরিচয়ের ওপরও আঘাত হানে। নিরলসভাবে ফিলিস্তিনি জলপাইবাগানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানো মধ্যে ইসরায়েলের এই পরিচয় মুছে ফেলার চেষ্টা প্রতিফলিত হয়। ১৯৬৭ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ইসরায়েলিরা ফিলিস্তিনের প্রায় ৮ লাখ জলপাইগাছ উপড়ে ফেলেছে।

দাজ্জাল, ইমাম মাহদি (আ.) ও ঈসা (আ.) এর আগমন এবং কেয়ামতের নিদর্শন সমূহ প্রকাশের ক্ষেত্রে ফিলিস্তিনির গুরুত্ব

১.দাজ্জালের আর্বিভাব: অভিশপ্ত দাজ্জাল কিয়ামতের পূর্ববর্তী সময়ে দুনিয়ায় আগমন করবে। সে নিজেকে আল্লাহ বলে দাবি করবে। বাইতুল মাকদিসে বসতি স্থাপন দাজ্জালের আর্বিভাবের অন্যতম লক্ষণ, পবিত্র হাদীসে বলা হয়েছে:

حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يَخَامِرَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :عُمْرَانُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَرَابُ يَثْرِبَ، وَخَرَابُ يَثْرِبَ خُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ، وَخُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ فَتْحُ قُسْطَنْطِينِيَّةَ، وَفَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ خُرُوجُ الدَّجَّالِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِ الَّذِي حَدَّثَهُ، - أَوْ مَنْكِبِهِ -ثُمَّ قَالَ :إِنَّ هَذَا لَحَقٌّ كَمَا أَنَّكَ هَاهُنَا«، أَوْ كَمَا أَنَّكَ قَاعِدٌ، يَعْنِي مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ

মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল মাকদিসে বসতি স্থাপন ইয়াসরিবের বিপর্যয়ের কারণ হবে এবং ইয়াসরিবের বিপর্যয় সংঘাতের কারণ হবে। যুদ্ধের ফলে কুসতুনতীনিয়া বিজিত হবে এবং কুসতুনতীনিয়া বিজয় দাজ্জালের আবির্ভাবের আলামত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন তার ঊরুতে বা কাঁধে নিজের হাত দ্বারা মৃদু আঘাত করে বলেন, এটা নিশ্চিত সত্য, যেমন তুমি এখানে উপস্থিত, যেমন তুমি এখানে বসা আছো। অর্থাৎ তিনি মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ)-কে লক্ষ করে বলেন। (সুনানে আবি দাউদ, হাদিস : ৪২৯৪)।

শেষ জামানায় দাজ্জাল ফিলিস্তিনে প্রবেশ করতে পারলেও মসজিদুল আকসায় প্রবেশ করতে পারবে না। দাজ্জালের জগতব্যাপী ফেতনা থেকে মহান আল্লাহ দুটি শহর ও চারটি মসজিদকে রক্ষা করবেন। শহর দুটি হলো মক্কা ও মদিনা ,হাদীসে এসেছে:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلاَّ سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ إِلاَّ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا نَقْبٌ إِلاَّ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ صَافِّينَ يَحْرُسُونَهَا ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلاَثَ رَجَفَاتٍ فَيُخْرِجُ اللهُ كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মক্কা ও মদিনা ব্যতীত এমন কোন শহর নেই যেখানে দাজ্জাল পদচারণ করবে না। মক্কা এবং মদিনার প্রত্যেকটি প্রবেশ পথেই ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে পাহারায় নিয়োজিত থাকবে। এরপর মদিনা তার অধিবাসীদেরকে নিয়ে তিনবার কেঁপে উঠবে এবং আল্লাহ তা'আলা সমস্ত কাফির এবং মুনাফিকদেরকে বের করে দিবেন। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ১৮৮১)

অন্যদিকে দাজ্জাল ফিলিস্তিনে প্রবেশ করতে পারলেও মসজিদুল আকসায় প্রবেশ করতে পারবে না। নবীজি (সা.) বলেন, দাজ্জাল চারটি মসজিদের নিকটে যেতে পারবে না। তা

হলো, মসজিদুল হারাম, মসজিদে মদিনা (নববী), মসজিদে তুর ও মসজিদে আকসা। (মুসনাদে আহমদ, হাদিস : ২৩৬৮৫)

২. **ইমাম মাহদি (আ.)-এর অবস্থান** : ইমাম মাহদি (আ.) শেষ মুহূর্তে মুসলিমদের নিয়ে মসজিদুল আকসায় আশ্রয় নেবেন। বাহিরে দাজ্জাল ইহুদিদের নিয়ে তাদের হত্যা করার জন্য বন্দি করে রাখবে। অন্যদিকে মুসলিমরাও দাজ্জালের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবে। এরই মধ্যে ঈসা (আ.) দামেস্কে আগমন করবেন এবং তিনি মুমিনদের রক্ষা করতে ফিলিস্তিনের রওনা হবেন। তিনি মসজিদুল আকসায় প্রবেশ করে মুসলমানদের নিয়ে ফজরের নামাজ আদায় করবেন এবং দাজ্জালকে হত্যার জন্য বের হবেন। দাজ্জাল পশ্চিম দিকে পালিয়ে যাবে। কিন্তু ফিলিস্তিনের লুদ নামক স্থানে তিনি তাকে হত্যা করবেন। (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ২২৪০; ইসলাম হিস্টোরি ডটকম)

৪. **ঈসা (আ.)-এর আগমন :** দাজ্জাল সম্পর্কিত সুনানে তিরমিজির দীর্ঘ বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায় ফিলিস্তিন হবে ঈসা (আ.)-এর বিচরণ ভূমি। এমনকি দাজ্জাল হত্যার পর ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব হলে তারা ফিলিস্তিনের 'আল খামার' পাহাড়ে এসে তাদের আগ্রাসন শেষ করবে। ঈসা (আ.) তখন মুমিনদের নিয়ে তুর পাহাড়ে চলে যাবেন। (বর্তমান ইসরাইলের একটি পাহাড়ের নাম তুর। তবে বিখ্যাত তুর পাহাড় মিসরে অবস্থিত)। এর দ্বারা বোঝা যায়, ইয়াজুজ-মাজুজ বাহিনীকে আল্লাহ ফিলিস্তিনে ধ্বংস করবেন এবং ফিলিস্তিন ভূমিকে অন্য ভূমির তুলনায় বেশি সময় নিরাপদ থাকবে।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، دَخَلَ حَدِيثُ أَحَدِهِمَا فِي حَدِيثِ الآخَرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ الطَّائِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكِلاَبِيِّ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الدَّجَّالَ ذَاتَ غَدَاةٍ فَخَفَّضَ فِيهِ وَرَفَّعَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ . قَالَ فَانْصَرَفْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَيْهِ فَعَرَفَ ذَلِكَ فِينَا فَقَالَ " مَا شَأْنُكُمْ " . قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ الْغَدَاةَ فَخَفَّضْتَ فِيهِ وَرَفَّعْتَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ . قَالَ " غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُ لِي عَلَيْكُمْ إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِنَّهُ شَابٌّ قَطَطٌ عَيْنُهُ قَائِمَةٌ شَبِيهٌ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنٍ فَمَنْ رَآهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ فَوَاتِحَ سُورَةِ أَصْحَابِ الْكَهْفِ قَالَ يَخْرُجُ مَا بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ فَعَاثَ يَمِينًا وَشِمَالاً يَا عِبَادَ اللَّهِ اثْبُتُوا " . قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا لُبْثُهُ فِي الأَرْضِ قَالَ " أَرْبَعِينَ يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ " . قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الْيَوْمَ الَّذِي كَالسَّنَةِ أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلاَةُ يَوْمٍ قَالَ " لاَ وَلَكِنِ اقْدُرُوا لَهُ " . قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا سُرْعَتُهُ فِي الأَرْضِ قَالَ " كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ فَيَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ فَيُكَذِّبُونَهُ وَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ فَتَتْبَعُهُ أَمْوَالُهُمْ فَيُصْبِحُونَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ فَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ وَيُصَدِّقُونَهُ فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ أَنْ تُمْطِرَ فَتُمْطِرَ وَيَأْمُرُ الأَرْضَ أَنْ تُنْبِتَ فَتُنْبِتَ فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ كَأَطْوَلِ مَا كَانَتْ ذُرًى وَأَمَدِّهِ خَوَاصِرَ وَأَدَرِّهِ ضُرُوعًا قَالَ ثُمَّ يَأْتِي الْخَرِبَةَ فَيَقُولُ لَهَا أَخْرِجِي كُنُوزَكِ فَيَنْصَرِفُ مِنْهَا

فَتَتْبَعُهُ كَيَعَاسِيبِ النَّحْلِ ثُمَّ يَدْعُو رَجُلاً شَابًّا مُمْتَلِئًا شَبَابًا فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جِزْلَتَيْنِ ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ يَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ هَبَطَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِشَرْقِيِّ دِمَشْقَ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ قَالَ وَلاَ يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ يَعْنِي أَحَدٌ إِلاَّ مَاتَ وَرِيحُ نَفَسِهِ مُنْتَهَى بَصَرِهِ قَالَ فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلَهُ قَالَ فَيَلْبَثُ كَذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ . قَالَ ثُمَّ يُوحِي اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ حَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ فَإِنِّي قَدْ أَنْزَلْتُ عِبَادًا لِي لاَ يَدَانِ لأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ . قَالَ وَيَبْعَثُ اللَّهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ كَمَا قَالَ اللَّهُ:) مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ (. قَالَ فَيَمُرُّ أَوَّلُهُمْ بِبُحَيْرَةِ الطَّبَرِيَّةِ فَيَشْرَبُ مَا فِيهَا ثُمَّ يَمُرُّ بِهَا آخِرُهُمْ فَيَقُولُ لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَاءٌ ثُمَّ يَسِيرُونَ حَتَّى يَنْتَهُوا إِلَى جَبَلِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَيَقُولُونَ لَقَدْ قَتَلْنَا مَنْ فِي الأَرْضِ هَلُمَّ فَلْنَقْتُلْ مَنْ فِي السَّمَاءِ . فَيَرْمُونَ بِنُشَّابِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرُدُّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نُشَّابَهُمْ مُحْمَرًّا دَمًا وَيُحَاصَرُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ يَوْمَئِذٍ خَيْرًا لأَحَدِهِمْ مِنْ مِائَةِ دِينَارٍ لأَحَدِكُمُ الْيَوْمَ . قَالَ فَيَرْغَبُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِلَى اللَّهِ وَأَصْحَابُهُ قَالَ فَيُرْسِلُ اللَّهُ إِلَيْهِمُ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى مَوْتَى كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ قَالَ وَيَهْبِطُ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ فَلاَ يَجِدُ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلاَّ وَقَدْ مَلأَتْهُ زَهَمَتُهُمْ وَنَتَنُهُمْ وَدِمَاؤُهُمْ قَالَ فَيَرْغَبُ عِيسَى إِلَى اللَّهِ وَأَصْحَابُهُ قَالَ فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ قَالَ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ بِالْمَهْبِلِ وَيَسْتَوْقِدُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ قِسِيِّهِمْ وَنُشَّابِهِمْ وَجِعَابِهِمْ سَبْعَ سِنِينَ قَالَ وَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَطَرًا لاَ يَكُنُّ مِنْهُ بَيْتُ وَبَرٍ وَلاَ مَدَرٍ قَالَ فَيَغْسِلُ الأَرْضَ فَيَتْرُكُهَا كَالزَّلَفَةِ قَالَ ثُمَّ يُقَالُ لِلأَرْضِ أَخْرِجِي ثَمَرَتَكِ وَرُدِّي بَرَكَتَكِ . فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ وَيَسْتَظِلُّونَ بِقِحْفِهَا وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْلِ حَتَّى إِنَّ الْفِئَامَ مِنَ النَّاسِ لَيَكْتَفُونَ بِاللَّقْحَةِ مِنَ الإِبِلِ وَإِنَّ الْقَبِيلَةَ لَيَكْتَفُونَ بِاللَّقْحَةِ مِنَ الْبَقَرِ وَإِنَّ الْفَخِذَ لَيَكْتَفُونَ بِاللَّقْحَةِ مِنَ الْغَنَمِ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ رِيحًا فَقَبَضَتْ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَيَبْقَى سَائِرُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ كَمَا تَتَهَارَجُ الْحُمُرُ فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ

আন-নাওয়াস ইবনু সামআন আল-কিলাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক সকালে দাজ্জাল প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। তিনি এর ভয়াবহতা ও নিকৃষ্টতা তুলে ধরেন। এমনকি আমাদের ধারণা সৃষ্টি হলো যে, সে হয়তো খেজুর বাগানের ওপাশেই বিদ্যমান।

বর্ণনাকারী বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে চলে গেলাম, তারপর আবার আমরা তার নিকট ফিরে এলাম। তিনি আমাদের মধ্যে দাজ্জালের ভীতির চিহ্ন দেখে প্রশ্ন করেনঃ তোমাদের কি হয়েছে? আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আপনি সকালে দাজ্জাল প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন এবং এর ভয়াবহতা ও নিকৃষ্টতা এমন ভাষায় উত্থাপন করেছেন যে, আমাদের ধারণা হচ্ছিল যে, হয়তো সে খেজুর বাগানের পাশেই উপস্থিত আছে।

তিনি বললেনঃ তোমাদের ক্ষেত্রে দাজ্জাল ছাড়াও আমার আরো কিছুর আশংকা রয়েছে। যদি সে আমার জীবদ্দশাতেই তোমাদের মাঝে আসে তাহলে আমিই তোমাদের পক্ষে তার প্রতিপক্ষ হবো। আর সে যদি আমার অবর্তমানে আবির্ভূত হয়, তাহলে তোমরাই তার

প্রতিপক্ষ হবে। আর আল্লাহ্ তা'আলাই প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আমার পরিবর্তে সহায় হবেন।

সে (দাজ্জাল) হবে কুঞ্চিত (কোকড়া) চুলবিশিষ্ট, স্থির দৃষ্টিসম্পন্ন যুবক, সে হবে আবদুল উযযা ইবনু কাতানের অনুরূপ। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তার দেখা পায় তাহলে যেন সে সূরা কাহফ-এর প্রাথমিক আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে। তিনি বললেনঃ সে সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী কোন এলাকা হতে আত্মপ্রকাশ করবে। তারপর সে ডানে-বামে ফিতনা ফ্যাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়াবে। হে আল্লাহর বান্দাহগণ! তোমরা দৃঢ়তার সাথে অবস্থান করবে।

আমরা প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। সে কত দিন দুনিয়াতে থাকবে? তিনি বললেনঃ চল্লিশ দিন। এর একদিন হবে একবছরের সমান, একদিন হবে একমাসের সমান এবং একদিন হবে একসপ্তাহের সমান, আর অবশিষ্ট দিনগুলো হবে তোমাদের বর্তমান দিনের মতো।

বর্ণনাকারী বলেন, আমরা প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আপনার কি ধারণা, যে দিনটি একবছরের সমান হবে, তাতে একদিনের নামায আদায় করলেই আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে? তিনি বললেনঃ না, বরং তোমরা সেদিনের সঠিক অনুমান করে নেবে (এবং সে অনুযায়ী নামায আদায় করবে)।

আমরা আবার প্রশ্ন করলাম, দুনিয়াতে তার চলার গতি কত দ্রুত হবে? তিনি বললেনঃ তার চলার গতি হবে বায়ুচালিত মেঘের অনুরূপ; তারপর সে কোন জাতির নিকট গিয়ে তাদেরকে নিজের দলের দিকে আহবান জানাবে, কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করবে এবং তার দাবি প্রত্যাখ্যান করবে। সে তখন তাদের নিকট হতে ফিরে আসবে এবং তাদের ধন-সম্পদও তার পিছনে পিছনে চলে আসবে। তারা পরদিন সকালে নিজেদেরকে নিঃস্ব অবস্থায় পাবে।

তারপর সে অন্য জাতির নিকট গিয়ে আহবান করবে। তারা তার আহবানে সাড়া দিবে এবং তাকে সত্য বলে মেনে নিবে। সে তখন আকাশকে বৃষ্টি বর্ষনের জন্য আদেশ করবে এবং সে অনুযায়ী আকাশ বৃষ্টি বর্ষন করবে। তারপর সে যামীনকে ফসল উৎপাদনের জন্য নির্দেশ দিবে এবং সে মুতাবিক যামীন ফসল উৎপাদন করবে। তারপর বিকেলে তাদের পশুপালগুলো পূর্বের চেয়ে উচু কুঁজবিশিষ্ট, মাংসবহুল নিতম্ববিশিষ্ট ও দুগ্ধপুষ্ট স্তনবিশিষ্ট হবে। তারপর সে নির্জন পতিত ভূমিতে গিয়ে বলবে, তোর ভিতরের খনিজভাণ্ডার বের করে দে। তারপর সে সেখান হতে ফিরে আসবে এবং সেখানকার ধনভাণ্ডার তার অনুসরণ করবে যেভাবে মৌমাছিরা রাণী মৌমাছির অনুসরণ করে।

তারপর সে পূর্ণযৌবন এক তরুণ যুবককে তার দিকে আহবান করবে। সে তলোয়ারের আঘাতে তাকে দুই টুকরা করে ফেলবে। তারপর সে তাকে ডাক দিবে, অমনি সে হাস্যোজ্জ্বল চেহারা নিয়ে সামনে এসে দাড়াবে।

হলুদ রংয়ের দুটি কাপড় পরিহিত অবস্থায় দুজন ফিরিশতার ডানায় ভর করে ঈসা ইবনু মারইয়াম (আঃ) অবতরণ করবেন। তিনি তার মাথা নীচু করলে ফোটায় ফোটায় এবং উচু করলেও মনিমুক্তার ন্যায় (ঘাম) পড়তে থাকবে। তার নিঃশ্বাস যে ব্যক্তিকেই স্পর্শ করবে সে মারা যাবে; আর তার শ্বাসবায়ু দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত পৌছবে। তারপর তিনি দাজ্জালকে খোঁজ করবেন এবং তাকে 'লুদ্দ'-এর নগরদ্বারপ্রান্তে পেয়ে হত্যা করবেন।

তিনি বলেনঃ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা মতো এভাবে তিনি অতিবাহিত করবেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা তার নিকট ওয়াহী প্রেরণ করবেনঃ "আমার বান্দাহদেরকে তুর পাহাড়ে সরিয়ে নাও। কেননা, আমি এমন একদল বান্দাহ অবতীর্ণ করছি যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ক্ষমতা কারো নেই"।

তিনি বলেন, তারপর আল্লাহ ইয়াজুজ-মাজুজের দল পাঠাবেন। আল্লাহ তা'আলার বাণী অনুযায়ী তাদের অবস্থা হলো, "তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি হতে ছুটে আসবে" (সূরাঃ আম্বিয়া-৯৬)। তিনি বলেন, তাদের প্রথম দলটি (সিরিয়ার) তাবারিয়া উপসাগর অতিক্রমকালে এর সমস্ত পানি পান করে শেষ করে ফেলবে। এদের শেষ দলটি এ স্থান দিয়ে অতিক্রমকালে বলবে, নিশ্চয়ই এই জলাশয়ে কোন সময় পানি ছিল। তারপর বাইতুল মাকদিসের পাহাড়ে পৌছার পর তাদের অভিযান সমাপ্ত হবে।

তারা পরস্পর বলবে, আমরা তো দুনিয়ায় বসবাসকারীদের ধ্বংস করেছি, এবার চল আকাশে বসবাসকারীদের ধ্বংস করি। তারা এই বলে আকাশের দিকে তাদের তীর নিক্ষেপ করবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের তীরসমূহ রক্তে রঞ্জিত করে ফিরত দিবেন। তারপর ঈসা ইবনু মারইয়াম (আঃ) ও তার সাথীরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়বেন। তারা (খাদ্যাভাবে) এমন এক কঠিন পরিস্থিতিতে পতিত হবেন যে, তখন তাদের জন্য একটা গরুর মাথা তোমাদের এ যুগের একশত দীনারের চাইতে বেশি উত্তম মনে হবে।

তিনি বলেন, তারপর ঈসা (আঃ) ও তার সাথীরা আল্লাহ্ তা'আলার দিকে রুজু হয়ে দু'আ করবেন। আল্লাহ তা'আলা তখন তাদের (ইয়াজুজ-মাজুজ বাহিনীর) ঘাড়ে মহামারীরূপে নাগাফ নামক কীটের উৎপত্তি করবেন। তারপর তারা এমনভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে যেন একটি প্রাণের মৃত্যু হয়েছে

তখন ঈসা (আঃ) তার সাথীদের নিয়ে (পাহাড় হতে) নেমে আসবেন। সেখানে তিনি এমন এক বিঘত পরিমাণ জায়গাও পাবেন না, যেখানে সেগুলোর পচা দুর্গন্ধময় রক্ত-মাংস ছড়িয়ে না থাকবে। তারপর তিনি সাথীদের নিয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করবেন। আল্লাহ তা'আলা তখন উটের ঘাড়ের ন্যায় লম্বা ঘাড়বিশিষ্ট এক প্রকার পাখি প্রেরণ করবেন। সেই

পাখি ওদের লাশগুলো তুলে নিয়ে গভীর গর্তে নিক্ষেপ করবে। এদের পরিত্যক্ত তীর, ধনুক ও তূণীরগুলো মুসলিমগণ সাতবছর পর্যন্ত জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করবে।

তারপর আল্লাহ তা'আলা এমন বৃষ্টি বর্ষণ করবেন যা সমস্ত ঘর-বাড়ী, স্থলভাগ ও কঠিন মাটির স্তরে গিয়ে পৌছবে এবং সমস্ত পৃথিবী ধুয়েমুছে আয়নার মতো ঝকঝকে হয়ে উঠবে। তারপর যামীনকে বলা হবে, তোর ফল ও ফসলসমূহ বের করে দে এবং বারকাত ও কল্যাণ ফিরিয়ে দে। তখন এরূপ পরিস্থিতি হবে যে, একদল লোকের জন্য একটি ডালিম পর্যাপ্ত হবে এবং একদল লোক এর খোসার ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবে।

দুধেও এরূপ বারকাত হবে যে, বিরাট একটি দলের জন্য একটি উটনীর দুধ, একটি গোত্রের জন্য একটি গাভীর দুধ এবং একটি ছোট দলের জন্য একটি ছাগলের দুধই যথেষ্ট হবে। এমতাবস্থায় কিছুদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর হঠাৎ আল্লাহ তা'আলা এমন এক বাতাস প্রেরণ করবেন যা সকল ঈমানদারের আত্মা ছিনিয়ে নেবে এবং অবশিষ্ট থাকবে শুধুমাত্র দুশ্চরিত্রের লোক যারা গাধার মতো প্রকাশ্যে নারী সম্ভোগে লিপ্ত হবে। তারপর তাদের উপর কিয়ামত সংঘটিত হবে। (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ২২৪০)

ফিলিস্তিন : মুসলিম উম্মাহ’র জন্য কেন গুরুত্বপূর্ণ

ফিলিস্তিন! ইতিহাসের আদিকাল হতে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ এর জন্য ফিলিস্তিন মুসলিম উম্মাহ’র জন্য পবিত্র ভূমি। আল আকসা প্রাঙ্গণের যেমন ধর্মীয় গুরুত্ব রয়েছে এর পাশাপাশি ফিলিস্তিনি জনগণের সংস্কৃতি ও জাতীয়তার প্রতীকও এটি। বর্তমান সীমানাগুলো তৈরি হবার আগের বছরগুলোতে, সেই পুরনো আমলে মুসল্লিরা পবিত্র শহর মক্কা ও মদিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেও সেই সফরে জেরুজালেমকেও অন্তর্ভুক্ত করতেন। আল-আকসার বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ এখনও হাজার হাজার ধর্মানুরাগীকে আকৃষ্ট করে, যারা প্রতি শুক্রবার জামাতে নামাজের জন্য জড়ো হন।

শেষ জামানার অসংখ্য ঘটনার ইংগিত রয়েছে এই ফিলিস্তিন, মসজিদুল আকসা’ কে ঘিরে। নবী (আ.) দের পদাচরনা, মোহাম্মদ (স.) এর মিরাজ, ইমাম মাহদী, ঈসা (আ.) এর আগমন ইত্যাদি ঘিরে রয়েছে মুসলামানদের গৌরবময় ইতিহাস এবং ভবিষ্যৎ বানী। সেই ফিলিস্তিন আজ একটি আহত, ক্ষতবিক্ষত দেহ। লাখো স্বাপদের দল যে শরীর খুবলে নিয়েছে তাদের হিংস্র নখর দিয়ে। শিশু, বৃদ্ধ, মহিলা কিছুই বাদ যায়নি তাদের সেই থাবা থেকে। হাজার হাজার মু’মিনের রক্তে আজ তাদের হাত রঞ্জিত। মু’মিনের রক্ত মর্যাদা বিষয়ে নবী (স.) এক হাদীসে উল্লেখ করেছেন:

حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي ضَمْرَةَ، نَصْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَيْسٍ النَّصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ وَيَقُولُ " مَا أَطْيَبَكِ وَأَطْيَبَ رِيحَكِ مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَحُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ حُرْمَةً مِنْكِ مَالِهِ وَدَمِهِ وَأَنْ نَظُنَّ بِهِ إِلاَّ خَيْرًا " .

আবদুল্লাহ ’ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে কাবা ঘর তাওয়াফ করতে দেখলাম এবং তিনি বলছিলেনঃ কত উত্তম তুমি হে কাবা! আর্কষীয় তোমার খোশবু, কত উচ্চ মর্যাদা তোমার (হে কাবা)! কত মহান সম্মান তোমার। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! আল্লাহর নিকট মুমিন ব্যক্তির জান-মাল ও ইজ্জতের মর্যাদা তোমার চেয়ে অনেক বেশী। আমরা মুমিন ব্যক্তি সম্পর্কে সুধারণাই পোষণ করি।

ইসলাম ধর্মের সর্বোচ্চ পবিত্র স্থান হতে মু’মিনের রক্ত জান-মাল ও ইজ্জতের মর্যাদা বেশি বলে নবী করিম (স.) পবিত্র মুখে বলেছেন, সেই মু’মিনের রক্তের উপর আজ হায়েনা’দের উল্লাস কি মুসলিম হৃদয়ে আঘাত হানে না? ক্ষত-বিক্ষত হয় না অন্তর?” ফিলিস্তিনি শিশু যখন বলে “ আমি আল্লাহর কাছে সব বলে দেব” তখন তোমার কি অন্তর প্রকম্পিত হয় না? খাদ্যর অভাবে ফিলিস্তিনের শিশু যখন বলে “আমি মরতে চাই, কারণ জান্নাতে অনেক

খাবার আছে” তখন তুমি কিভাবে ভোগ-বিলাসিতায় মত্ত হতে পারো, হে মুসলিম উম্মাহ! যদি তোমার অন্তর প্রকম্পিত না হয় তবে তারা মুসলিমের লেবাসে মুনাফিক বলেই আপাত:দৃষ্টিতে মনে হয় (আল্লাহ'ই ভালে জানেন)।

ফিলিস্তিন ইসলামি ভূখন্ড, এতে শিথিলতা করার মানে হচ্ছে দ্বীনের মধ্যে শিথিলতা । বর্তমানে আমেরিকা, ইউরোপ সহ বিশ্বের প্রভাবশালী দেশগুলো ইসরায়েলের নির্মম গণহত্যাকে সহযোগিতা করছে, ফিলিস্তিনিদের প্রতি এই নিরন্তর অমানবিকতা আমাদের কমিউনিটির মধ্যে হতাশা ছড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু গাজার মানুষ যখন গণহত্যার মধ্যে বেঁচে থাকার সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে, তখন আমাদের হাল ছাড়ার কোনো অধিকার নেই। আমাদের নিজেদের মধ্যে ফিলিস্তিনিদের দৃঢ়তা জাগিয়ে তুলতে হবে এবং অন্য সমাজকে জানাতে হবে যে আমরা আছি, আমরা বেঁচে আছি এবং আমরা এমন এক পৃথিবীতে টিকে থাকব, যে পৃথিবী আমাদের মুছে ফেলার চেষ্টা করছে।

মুসলিম উম্মাহ'র করণীয়

প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরে ফিলিস্তিন ভূমির ভালোবাসা প্রোথিত। তারা পবিত্র এই ভূমির মুক্তি কামনা করে এবং তারা চায় এখানে সব ধরনের হানাহানি বন্ধ হোক এবং ইবরাহিম (আ.)-এর প্রকৃত উত্তরসূরীরা নিরাপদে জীবনযাপন করুক। কিয়ামতের আগে পৃথিবীতে আবারো ইসলামী খেলাফত বা নববী শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। আর সেই শাসনের সূচনা হবে ফিলিস্তিন থেকে।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي ضَمْرَةُ، أَنَّ ابْنَ زُغْبٍ الْإِيَادِيَّ، حَدَّثَهُ قَالَ :نَزَلَ عَلَيَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَوَالَةَ الْأَزْدِيُّ، فَقَالَ لِي :بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَغْنَمَ عَلَى أَقْدَامِنَا فَرَجَعْنَا، فَلَمْ نَغْنَمْ شَيْئًا، وَعَرَفَ الْجَهْدَ فِي وُجُوهِنَا فَقَامَ فِينَا، فَقَالَ :اللَّهُمَّ لَا تَكِلْهُمْ إِلَيَّ، فَأَضْعُفَ عَنْهُمْ، وَلَا تَكِلْهُمْ إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَيَعْجِزُوا عَنْهَا، وَلَا تَكِلْهُمْ إِلَى النَّاسِ فَيَسْتَأْثِرُوا عَلَيْهِمْ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِي، أَوْ قَالَ :عَلَى هَامَتِي، ثُمَّ قَالَ :يَا ابْنَ حَوَالَةَ، إِذَا رَأَيْتَ الْخِلَافَةَ قَدْ نَزَلَتْ أَرْضَ الْمُقَدَّسَةِ فَقَدْ دَنَتِ الزَّلَازِلُ وَالْبَلَابِلُ وَالْأُمُورُ الْعِظَامُ، وَالسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنَ النَّاسِ مِنْ يَدِي هَذِهِ مِنْ رَأْسِكَ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ :عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَوَالَةَ حِمْصِيٌّ

দামরাহ ইবনু যুগব আল-ইয়াদী (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা 'আব্দুল্লাহ ইবনু হাওয়ালা আল-আযদী (রাঃ) আমার মেহমান হলেন। তিনি আমাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পদাতিক বাহিনীকে গানীমাত লাভের উদ্দেশ্যে যুদ্ধে প্রেরণ করলেন। 'আমরা ফিরে এলাম, অথচ কোনো গানীমাত পেলাম না। তিনি আমাদের চেহারায় ক্লান্তির ছাপ লক্ষ্য করলেন। তিনি আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেনঃ "হে আল্লাহ! তাদের ক্লান্তি দূর করতে তাদেরকে আমার দিকে সোপর্দ করো না। এবং তাদেরকে তাদের দিকেও সোপর্দ করো না, তাহলে লোকেরা তাদের উপর প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পাবে।"

(ইবনু হাওয়ালা বলেন), এরপর তিনি আমার মাথা বা মাথার তালুতে হাত রেখে বললেনঃ হে ইবনু হাওয়ালা! যখন তুমি দেখবে যে, বাইতুল মাকদিসে (সিরিয়ার) ভূমিতে খিলাফাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন মনে করবে অধিক ভূমিকম্প, বিপদ-আপদ, মহা দূর্ঘটনা ও পেরেশানী সন্নিকটে। কিয়ামত তখন মানুষের এতই নিকটবর্তী হবে, যেমন আমার এ হাত তোমার মাথার যত নিকটে রয়েছে।

বায়তুল মুকাদ্দাস তথা ফিলিস্তিনকে মহানবী (সা.) বিজয়ীদের ভূমি হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ حَدَّثَنِي مَهْدِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ عَنِ السَّيْبَانِيِّ وَاسْمُهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيِّعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الدِّينِ ظَاهِرِينَ لَعَدُوِّهِمْ قَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ إِلَّا مَا أَصَابَهُمْ مِنْ لَأْوَاءَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَأَيْنَ هُمْ؟ قَالَ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ

আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, ‘রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, আমার উম্মতের একটি দল সত্যের ওপর বিজয়ী থাকবে। শত্রুর মনে পরাক্রমশালী থাকবে। দুর্ভিক্ষ ছাড়া কোনো বিরোধী পক্ষ তাদের কিছুই করতে পারবে না। আল্লাহর আদেশ তথা কিয়ামত পর্যন্ত তারা এমনই থাকবে। সাহাবিরা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! তারা কোথায় থাকবে? রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, তারা বায়তুল মুকাদ্দাস এবং তার আশপাশে থাকবে।’ (মুসনাদে আহমদ, হাদিস : ২২৩২০)

কিয়ামতের আগে ফিলিস্তিন ভূমি থেকে অবশ্যই অবৈধ দখলদারিত্বের অবসান এবং মুসলানের বিজয় আসবে। যদিও সে বিজয় হবে কিয়ামতের নিদর্শনস্বরূপ। হাদিসের বর্ণনা ও ঐতিহাসিকদের ব্যাখ্যা অনুসারে ঈসা (আ.) দাজ্জাল ও তার অনুসারী ইহুদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন। তাদের যুদ্ধ হবে ফিলিস্তিন ভূমিতে। ঈসা (আ.) ফিলিস্তিনের লুদ শহরে দাজ্জালকে হত্যা করবেন। অতঃপর যুদ্ধে ইহুদিদের পরাজিত করবেন। তারা পালিয়েও আত্মরক্ষা করতে পারবে না। এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীসটি পাওয়া যায়:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرُ يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ . إِلاَّ الْغَرْقَدَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ " .

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত না তোমরা ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। এমনকি কোন ইয়াহূদী পাথর ও গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকলে, পাথর ও গাছ বলবে, ‘হে মুসলিম, হে আল্লাহর বান্দা আমার পেছনে ইয়াহূদী আছে, তাকে হত্যা কর।’

গারকাদ গাছ এ কথা বলবে না কেননা গারকদ গাছ ইয়াহুদী’দের গাছ। (সহীহুল বুখারী ২৯২৬, মুসলিম ১৫৭, ২৯২২, আহমাদ ৮৯২১, ১০৪৭৬, ২০৫০২)

মুসলিম উম্মাহ হাত গুটিয়ে বসে থাকলে কিভাবে সত্যের উপর বিজয়ী হবে? আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন,

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শুক্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপর ও যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ তাদেরকে চেনেন। বস্তুতঃ যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোন হক অপূর্ণ থাকবে না। (সুরা আনফাল, আয়াত: ৬০)

প্রকৃত ঈমানদার কখনো হীন বল হয় না, পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে:‘তোমরা হীনবল হয়ো না। তোমরাই বিজয়ী থাকবে, যদি তোমরা প্রকৃতার্থে ঈমানদার হও.”

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও তবে, তোমরাই জয়ী হবে। (সূরা আল ইমরান ১৩৯)

নারীদের কর্তব্য: ইসলামের শুরু থেকেই মু’মিন নারীগণ তাদের কর্তব্য পালনে কোন শিথিলতা করেননি। তাদের গুরুত্বের ব্যপারে কখনো অবহেলা করেননি। নারীদের কাঁধে অর্পিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটি হচ্ছে, এমন একটি প্রজন্ম তৈরী করা যারা সঠিক ইসলামি শিক্ষাকে আকঁড়ে ধরবে। উম্মাহকে নিয়ে যে ষড়যন্ত্র হচ্ছে সে সর্ম্পকে সচেতন থাকবে। নারীদের কিছু কর্তব্য নিচে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

১. নারীরা তাদের কলিজার টুকরো সন্তানদেরকে আল্লাহ তালার জন্য নিবেদিত করা, তাদেরকে মুজাহিদ, আলেম, চিন্তক, বক্তা, দ্বীনের দা’য়ি ইত্যাদি রূপে প্রস্তুত করা।

২.সন্তানের শৈশব থেকেই তাদেরকে ফিলিস্তিন সর্ম্পকে বিস্তারিত জানানো।

৩..সন্তানদের কাছে ইসলামি ইতিহাস থেকে উদাহরণ তুলে ধরা। ইমাদুদ্দিন জিনকি, নুরুদ্দিন মাহমুদ জিনকি এবং সালাউদ্দিন আইয়ুবি প্রমুখ ব্যাক্তি গণের ইসলামে অবদান বর্ণনা করা।

৪.ফিলিস্তিনের সমর্থনে অনলাইন ব্লগ প্রতিষ্ঠা করা এবং লেখালেখি ও প্রচারের মাধ্যমে তার সাথে সম্পৃক্ত থাকা।

৫, আমেরিকান, ব্রিটিশ, ইহুদি এবং ইহুদি সমর্থনে যত পণ্য আছে এগুলো বয়কট করার সাথে সাথে বিকল্প পণ্যের অনুসন্ধান ও উৎস তৈরী করা।

৬. শিশুদের কাছে বয়কটের অর্থ এবং গুরুত্ব তুলে ধরা এবং আমেরিকা, ব্রিটিশ, ইহুদিদের জীবনযাত্রা, পণ্য ইত্যাদি'র দাসে পরিণত না করা।

৭..টাকা পয়সা, অলংকার ইত্যাদি দান করার মাধ্যমে জিহাদে শরিক হওয়া।

৮.শিশুদের তাদের খরচ থেকে কিছু অংশ ফিলিস্তিনের ভাইদের সাহায্যের জন্য দান করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা।

৯.ফিলিস্তিনের ইতিহাস নিয়ে গভীর জ্ঞানার্জনের চেষ্টা করা।

১০. নারীরা নিজে, স্বামী ও পরিবার নিয়ে প্রাত্যহিক দোয়া, আমল এবং রোনাজারি করা, যেন আল্লাহ তাআলা মুসলিম ভাইদের সাহায্য করেন এবং ফিলিস্তিনকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করে দেন।

ফিলিস্তিনে জিহাদ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে মিশরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাতওয়া এবং আরব ও ইসলামি বিশ্বের প্রতি ফিলিস্তিনের পুনরুদ্ধার এবং মসজিদুল আকসা রক্ষায় উদাত্ত আহবান (৪)

হে মুসলিম উম্মাহ! সিদ্ধান্ত স্থির হয়ে গেছে। অত্যাচার এবং সীমালঙ্ঘনের ফলে ফিলিস্তিন হয়ে উঠেছে উত্তপ্ত। সেখানেই আছে ইসলামের প্রথম কিবলা এবং তৃতীয় সম্মানিত মসজিদুল আকসা। মহনবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেরাজের সমাপ্তি ছিল যেখানে।
সিদ্ধান্ত স্থির হয়ে গেছে। আপনাদের কাছে এ কথা স্পষ্ট যে, বাতিল সর্বদা তার ভ্রান্তিতে অটল থেকেছে এবং প্রবৃত্তি মানুষের বিবেক দখল করে নিয়েছে। যে প্রতিশ্রুতিকে ন্যায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বলে ধারণা করে থাকে, মূলত এর মাধ্যমেই তারা অন্যায় এবং অত্যাচারের পথকে সুগম করে থাকে। যারা আমাদেরকে নিজ ভূখন্ডে লাঞ্ছিত করতে চায়, আমাদের বুকে আঘাত করতে চায় এবং যে জাতিকে আল্লাহ তাআলা ভাষা এবং অনুভূতির মাধ্যমে একই সুতোয় গেঁথে দিয়েছেন; সেই জাতির মেরুদন্ড গুঁড়িয়ে দিতে চায়, এখন থেকে তাদের অত্যাচারের ওপর আর ধৈর্য করা হবে না।
জাক্তিতিসংঘ নিশ্চয়ই অন্যায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এতে ন্যায় ও সত্যের কোনো ছিটেফোঁটা নেই। ফিলিস্তিন আরব এবং মুসলিমদের ভূখন্ড। এই ভূখন্ডের জন্য তারা নিজেদের অমূল্য প্রাণ এবং রক্তকণা ব্যয় করেছেন। নিশ্চয়ই তা আরব এবং মুসলিম ভূখন্ড হিসেবেই অক্ষত থাকবে। বাতিল শক্তি যতই বিরোধিতা করুক, তা হবে নিষ্ফল। যারা ফিলিস্তিন দখল অথবা ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করবে, তাদের কারও অস্তিত্ব থাকবে না।
অত্যাচারীরা ইতোপূর্বেও এই পবিত্র ভূমির অনিষ্টা সাধনের চেষ্টা করেছে। কিন্তু তারা আরব এবং মুসলিম সন্তানগণকে দেখেছে সুদৃঢ় পাহাড়ের মতো অটল হয়ে দাড়াঁতে। শত্রুর আক্রমণ যত বেড়েছে তারাও পূর্বের চেয়ে উদ্যমী হয়ে প্রতিরক্ষায় দাড়িঁয়ে গেছে এবং শত্রুদেরর নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছে। এখনো আমাদের মাঝে সেই বীর মুজাহিদগণ রয়েছেন। আর ইতিহাস অবশ্যই তার আগের রূপে ফিরে আসবে।
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ

তবে তাদের কথা ভিন্ন, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং আল্লাহ কে খুব স্মরণ করে এবং নিপীড়িত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। নিপীড়নকারীরা শীঘ্রই জানতে পারবে তাদের গন্তব্যস্থল কিরূপ। (সুরা শুআরা:২২৭)

হে আরব এবং মুসলিম সন্তানগণ!

ইতিপূর্বে আপনারা ক্ষমার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন এবং আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা অনুযায়ী দলিল- প্রমাণের মাধ্যমে লড়াই করেছেন। ফলে লোকদের সামনে সত্য দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু জায়নবাদী কুচক্রী মহল তাদের কুটকৌশল এবং সম্পদের মাধ্যমে জোরপূর্বক মুসলিমদের এই প্রতিষ্ঠিত সত্য অধিকার দখল করে নিয়েছে। অতঃপর সবাই এমন ভান করেছে যেন তারা কিছুই দেখে না, কিছুই শোনে না এবং কোন ঘ্রাণ অনুভব করে না। তাই একক জাতি হিসেবে নিজেদের নিয়েই আপনাদের প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। দাড়াঁতে হবে ন্যায়ের সাহায্যে শত্রুর বিরুদ্ধে। এই জিহাদের মাধ্যমেই আপনারা হৃত অধিকার আদায়ে এবং তার সুরক্ষায় সক্ষম হবেন। জিহাদের যত পন্থা আছে তা শরিয়তসম্মত এবং জিহাদ সম্পর্কিত কথামালা গ্রহণযোগ্য। এর মাধ্যমে আপনারা নিজেদের অস্তিত্ব এবং পরবর্তী প্রজন্মের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সক্ষম হবেন। তাই প্রতিরক্ষায় উদ্যমী হোন, গুহা থেকে তাড়িয়ে দিন নেকড়েগুলোকে এবং আল্লাহর রাহে যথাযথভাবে জিহাদে অবতীর্ণ হোন।

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

কাজেই আল্লাহর কাছে যারা পার্থিব জীবনকে আখেরাতের পরিবর্তে বিক্রি করে দেয় তাদের জেহাদ করাই কর্তব্য। বস্তুতঃ যারা আল্লাহর রাহে লড়াই করে এবং অতঃপর মৃত্যুবরণ করে কিংবা বিজয় অর্জন করে, আমি তাদেরকে মহাপুণ্য দান করব। (সুরা নিসা:৭৪)

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

যারা ঈমানদার তারা যে, জেহাদ করে আল্লাহর রাহেই। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা লড়াই করে শয়তানের পক্ষে সুতরাং তোমরা জেহাদ করতে থাক শয়তানের পক্ষালম্বনকারীদের বিরুদ্ধে, (দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল। (সুরা নিসা:৭৬)

প্রিয় মুসলিম সন্তানগণ!

প্রস্তুতি গ্রহণ করুন এবং অবিচলতার সাথে সকলে বেরিয়ে পড়ুন। ভয় করুন, ইতিহাসে যেন এ কথা না লিখা হয়, ‘সম্ভ্রান্ত আরবরা অত্যাচারের সামনে অবনত হয়েছে অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে লাঞ্জনাকে মেনে নিয়েছে।’

এখন সময় তেজস্বী বক্তৃতার। এখন সময় চূড়ান্ত ফায়সালার, এতে কোনো হঠকারিতা নেই। তাই কুচক্রী মহলের চক্রান্ত এবং অত্যাচারীদের নিপীড়ন রুখে দিতে প্রত্যেক আরব এবং পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তের মুসলিম ব্যাক্তির উচিত নিজ সাধ্যানুযায়ী জান-মাল ব্যয় করা। দুশমনের সকল উপায় এবং পথ বন্ধ করে দিন। সম্ভাব্য সকল ফন্দি এঁটে তাদেরকে করে ফেলুন নাজেহাল। বয়কট করুন তাদের সাথে ব্যবসা এবং লেনদেন। নিজেদের মাঝেই প্রস্তত করুন জিহাদি বাহিনী এবং পালন করুন আপনাদের ওপর আরোপিত আল্লাহ তালার ফরজ বিধান। জেনে রাখুন, এই সময় প্রত্যেক সক্ষম ব্যাক্তির ওপর তার জান অথবা মালের মাধ্যমে জিহাদ করা ফরজ ফরজে আইনে পরিণত হয়েছে। যে ব্যাক্তি এই আবশকীয় দায়িত্ব থেকে পিছিয়ে থাকবে সে হবে আল্লাহ তালার ক্রোধের শিকার এবং বিরাট গোনাহের ভাগীদার।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহেঃ অতঃপর মারে ও মরে। তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেন-দেনের উপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। আর এ হল মহান সাফল্য। (সুরা তওবা: ১১১)

তাই মুমিন হিসেবে আপনাদের জান-মাল আল্লাহ তাআলার কাছে বিক্রীত। এখন সেই ব্যয় এবং সমর্পনের সময়ে এসে গেছে। তাই আপনারা আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি পূরণ করুন, তিনিও আপনাদের সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি পূরণ করবেন। পবিত্র ভূমির সম্মানহানির ফলে আপনাদের ক্রোধ এবং সত্যের পক্ষে আপনাদের অবিচলতার সাক্ষী হোক পৃথিবী। আপনাদের এই ক্রোধ যেন হয় মুসলিম উম্মাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে। যারা আপনাদের কাছে সুবিচার কামনা করে তাদের বিরুদ্ধে নয়। তাদের স্বদেশে জীবনযাপন এবং আপনাদের কাছে নিরাপত্তা কামনার অধিকার। তাই তাদের কারও ওপর সীমালঙ্গন থেকে বিরত থাকুন।

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

আর লড়াই কর আল্লাহর ওয়াস্তে তাদের সাথে, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে। অবশ্য কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না (সুরা বাকার: ১৯০)।

পূর্ব-পশ্চিমে, উত্তরে-দক্ষিণে পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তরে মুসলিমদের কণ্ঠে সমস্বরে বেজি উঠুক একটাই প্রতিধ্বনি: আল-জিহাদ, আল-জিহাদ।

[৪] ফিলিস্তিন: বেচেঁ থাকার লড়াই, ড. রাগিব সারজানি পৃষ্ঠা: ২০৬ থেকে।

আল্লাহ নির্যাতিত ফিলিস্তিনি মুসলমানের মুক্তি তরান্বিত করুন। আমিন।